Vol. 54 | No. 2 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অস্বীকৃত আঁতুড় : শহীদুল জহিরের 'পারাপার'

Volume	54
Issue	2
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মো. শরীফুল ইসলাম
Published online	February 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i2.5
Pages	৭৭-১০৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

অস্বীকৃত আঁতুড় : শহীদুল জহিরের 'পারাপার'

মো. শরীফুল ইসলাম*

সারসংক্ষেপ : শহীদুল জহির স্বল্পপ্রজ কথাসাহিত্যিক হলেও বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ধারায় তাঁর অবস্থান স্বতন্ত্র। সত্তরের দশকে গল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটলেও তিনি স্বকীয় আত্মপরিচয় নির্মাণসমর্থ হয়ে উঠেছেন নব্বই দশকের গোড়ায় এবং স্বভাবশিল্পীর মতোই পরবর্তীকালে অস্বীকার করতে চেয়েছেন নিজের আবির্ভাবকালীন রচনা 'পারাপার' নামক গল্পগ্রন্থটিকে। কিন্তু চাইলেই সবকিছু ছেঁটে ফেলে আঁতুড়-অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কেননা আবির্ভাব-বিন্দুই রেখার গতিশক্তির সূত্র; সেখানেই নিহিত থাকে তার পরবর্তী বিস্তারপ্রকৃতির তাবৎ-চিহ্ন। বর্তমান নিবন্ধে শহীদুল জহিরের সেই আঁতুড়গন্ধী রচনার অন্তর্বিশ্লেষণ করে তাঁর পরবর্তীকালীন লেখকসত্তার উৎসসূত্র সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের অনধিক ছয় দশকের[১] পথচলায় কুড়িয়ে পাওয়া মুক্তোর মতো যে হাতে-গোনা কজন কথাসাহিত্যিকের আলোকঝলক হয়ে উঠেছে দিকনির্দেশী এবং উৎকর্ষধৃত মানের দণ্ড, শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮) তাঁদের মধ্যে পরলোকগত অনুজানুজ[২]। উচ্চমান জীবনের উত্তলপৃষ্ঠে[৩] থেকেও নিয়ত জনবিচ্ছিন্নতাপ্রিয় এই শিল্পী ছিলেন স্বল্পপ্রজ, কিন্তু একইসাথে ছিলেন বাংলাদেশের সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট শিল্পদৃষ্টান্তের নির্মাতা[৪]। তবে স্বাভাবিক শোণিতলালিত[৫] শিল্পীপ্রতিভার অপরিশীলিত উন্মোচনে আত্মপ্রকাশ তিনি করেননি বরং তৎপূর্বে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের উৎকৃষ্টতম ধারার[৬] উত্তরাধিকার হিসেবে হয়েছিলেন সমাত্ম। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ *পারাপার*[৭]-এর প্রতিটি ভাবনার বিন্যাসে সেই উত্তরাধিকার-অভিজ্ঞান হয়ে আছে উৎকীর্ণ। যদিও স্বীকৃত স্বকীয়তা প্রাপ্তি ও আত্মোপলব্ধির পর শহীদুল জহির সেই অভিজ্ঞানাকীর্ণ গ্রন্থকে করতে চেয়েছেন অস্বীকার[৮], তবুও সেই গ্রন্থটি হয়ে আছে একজন শিল্পীর উদ্ভাসনের প্রামাণিক সত্যের চিহ্ন। আঁতুড়ের গন্ধমাখা কাগজের ঘরের মতো ওই গ্রন্থটিই ঘোষণা করছে কথাকার শহীদুল জহিরের শিল্পশৈশবীয় অভিব্যক্তি।

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্বদ্যিালয়, ঢাকা।

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা[৯] উপন্যাস থেকে শেষাবধি (মৃত্যু পর্যন্ত) আখ্যানবয়নের কৌশলে ও বিষয়ভাবনার অনন্যতায় যে শহীদুল জহিরকে বাংলাসাহিত্য অবলোকন করে, *পারাপার*-পর্যায়ে শহীদুল জহিরের সেই শিল্পধ্যানের কায়া অনুপস্থিত। তখন যে শিল্পী গল্পের পসরা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি চলনে-বলনে ও ভাবনায় বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের পুরুষোত্তম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র-ই উত্তরপুরুষ। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে চেতনার অগ্নিতে শুদ্ধ করে ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা কথাসাহিত্যে যে আন্তর্জাতিকতার[১০] ছোঁয়া দিলেন, যার ছোঁয়ায় জেগে উঠল বাঙালি-জীবনের অন্তর্বাসিনী রাজকন্যা, বাংলাদেশের সাহিত্য তৎপরবর্তীকালে সেবা করেছে মূলত সেই রাজকন্যার-ই। হাজারো সেবকের মধ্যে কয়েকজন সাহিত্যিক অর্জন করেছিলেন সেই রাজকন্যার সুযোগ্য রাজপুত্রের মর্যাদা, শহীদুল জহির তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বলতম কনিষ্ঠজন। জীবনের ঋজু গল্প সরল ভাষায় বর্ণনার দীর্ঘকালচর্চিত রীতিতে ডুবন্ত অন্তঃশীলার[১১] অস্তিত্ব স্বীকৃতি দিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলাদেশের গল্পকে করে তুলেছিলেন দ্বিস্বরিক, কখনও বা বহুস্বরা[১২]। উত্তরকালীন শিল্পীরা সেই স্বরবহুলতায় যুক্ত করেছেন বহুবৈচিত্র্য, বাংলা গল্প হয়ে উঠেছে বহুকৌণিক-পাঠসম্ভব। চরিত্রের জীবনের উপরিতল, প্রতিবেশের বিভিন্নতাসৃষ্ট বিচিত্র অভিঘাত, অভিঘাতজাত মনঃসংগঠন– তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অর্থ-সমাজ ও রাজনীতির বহির্বিন্যাস ও অন্তর্বিন্যাস, সর্বোপরি মানুষের জীবনের বহুচূর্ণখণ্ডের সমস্ত আখ্যান অন্তর্ভূত হয়েছে বাংলাদেশের গল্পের বিষয়-বলয়ে। শহীদুল জহির এই ওয়ালীউল্লাহ্-উত্তর বাংলাদেশের কথাশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। ফলত তাঁর প্রথমদিকের রচনায় রয়ে গেছে সেই মিথস্ক্রিয়াকালীন শিল্পচিহ্ন, যদিও, হয়তো একারণেই, তিনি সেই প্রথম গল্পগ্রন্থটিকে করতে চেয়েছেন অস্বীকার, তবুও এটিই তাঁর আঁতুড়গন্ধী শিল্পাভিজ্ঞান।

এই আঁতুড়কালীন গল্পগ্রন্থে পরিমিত শিল্পবোধের উত্তরাধিকার শহীদুল জহির মাত্র পাঁচটি গল্প প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি গল্পের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে সেইসব মানুষের জীবনকে ঘিরে, সমাজের অন্তে যাদের বসবাস, সংগ্রাম যাদের নিত্যকর্ম, পরাজয় যাদের নিয়তিলিখন। তবুও মাঝে মাঝে জ্বলে উঠতে চায় জীবনপ্রদীপ, বেঁচে থাকার সক্ষমতাকে করে নিতে চায় পরখ। সেখানেই সৃষ্টি হয় সৌন্দর্যের; শহীদুল জহির এই গল্পগ্রন্থে সেই নান্দনিকতার স্বরূপান্বেষী। সেই অন্বেষণে অগ্রজদের দেখানো পথেই হেঁটেছেন তিনি[১৩], তবে দৃষ্টির আলোকটুকু একান্তই নিজের। সৃজনের খেয়ালে আত্মভোলা ঈশ্বর যেন ধীরে ধীরে সকল সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, সৃষ্টির মধ্য দিয়েই গড়ে তুলেছেন নিজেকে; পূর্বকল্প ধারায় তাতে ছেদ পড়ল কি না তা বেমালুম ভুলে গিয়ে নতুনত্বে মেতে উঠেছেন[১৪]।

রচনার কাল বিচারে 'ভালোবাসা' শহীদুল জহিরের প্রথম গল্প[১৫]। গল্পটি আবর্তিত হয়েছে আবেদা আর হাফিজদ্দির দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসার জীবনের একদিনের ঘনীভূত

ভালোবাসার প্রকাশকে ঘিরে। চরিত্র দুটি শহুরে নাগরিক নয়, শহীদুল জহিরের ভাষায় তারা 'শহুরে ঢাকাইয়া'। অর্থনৈতিক স্তরায়ণে তাদের অভিধা নিম্নবিত্ত বা গরিব। লেখকের ভাষায় 'শহরের গরিব'[১৬]।

শহীদ দিবসের জন্য সবাইকে ফুল ছিঁড়তে দেখে নিজেও একটি ফুল ছিঁড়ে এনে হাফিজদ্দি ঘরে রেখে দিতে চায় পানিতে ভিজিয়ে, দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখতে চায় সৌন্দর্যটুকুকে। কিন্তু সৌন্দর্য-চর্চায় অনভ্যস্ত সংসারে ফুল বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র মামুলি উপকরণ খালি বোতল। বোতলে ভিজিয়ে রেখে অগত্যা আবেদার জিম্মায় রেখে হাফিজদ্দি চলে যায় বাইরে। তার যাওয়া ও ফিরে আসার অন্তর্বর্তী সময়টুকুতে আবেদার মনে জেগে ওঠে নারী-মনের স্বাভাবিক সজ্জাবোধ। ফুলটি সে চুলে গুঁজে নিজের লাবণ্য বাড়িয়ে নিতে চায়, কিন্তু স্বামীর ভয়ে সে কিছুই করতে পারে না, চুল থেকে খুলে ফুলটিকে রেখে দেয় যথাস্থানে। হাফিজদ্দি ফিরে এসে ফুলের ধ্বস্তরূপ দেখে সন্দেহ করে, ফুলে পায় চুল। খাবার সময় জিজ্ঞাসা করে আবেদাকে। সে অস্বীকার করে ভয়ে। কিন্তু হাফিজদ্দি চুলের প্রমাণ দেয় অকাট্যভাবে। ভয় হয় আবেদার। তবে হাফিজদ্দি ভয় দেখানোর কোনো উদ্যোগ নেয় না, অভাবিতপূর্ব বাক্য বলে সে, "ফুলটা তরে দিয়া দিলাম যা।"[১৭]

শ্রেণিচৈতন্য শহীদুল জহিরের ছিলো সুতীব্র,[১৮] তাই সেই জীবনকে দেখার পরিপূর্ণতা ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি আবেদা-হাফিজদ্দির জীবনকে স্বল্পতম দূরত্ব থেকে অবলোকন করেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের জীবনের রং। তাই গল্পের মধ্যে রাঙাতে সক্ষম হয়েছেন সেই জীবন। একেবারেই উন্মুল, শাহরিক সংকীর্ণ বস্তিজীবনের দুই বাসিন্দা আবেদা ও হাফিজদ্দি। তাদের জীবনে ভালোবাসার প্রাচুর্যের চেয়ে ক্ষুধার দাপট বেশি। তাই ভালোবাসার প্রকাশ তাদের সুমার্জিত নয়, পরিপার্শ্ব থেকে দেখে যে শাহরিক ভালোবাসার পদ্ধতি তারা রপ্ত করতে চায় তার প্রকাশ তারা কল্পনা মোতাবেক প্রকাশ করতে পারে না। সে জন্য প্রয়োজনীয় রূপ আর পোশাক তাদের নেই, নেই ভাষা, স্বপ্ন তৈরি করলেও সে স্বপ্ন মিলে যায় সিনেমার[১৯] দৃশ্যের সঙ্গে। কল্পবাস্তব সিনেমার মতোই তাদের ভালোবাসার প্রকাশ হয়ে উঠতে চায় কিন্তু নিজেদের অক্ষমতা তাকে শেষ পর্যন্ত কর্কশ ও রূঢ়-ই করে রাখে।

শহীদুল জহিরের শিল্পীমনে এই সকল যুক্তিবোধ ছিল প্রবল, ফলে তিনি নির্মোহ ভঙ্গিমার সঙ্গেই 'ভালোবাসা' গল্পের ভালোবাসা বর্ণনা করেছেন। এসকল যুক্তি লেখকের মনে প্রবল ছিল বলেই তিনি ফুল ছিঁড়তে গেলে হাফিজদ্দির মনে অন্যদের মতো শহীদ দিবসের আবেগ জাগাতে পারেননি, কেননা শহীদ দিবসের উদযাপন প্রধানত মার্জিত রুচির অভিপ্রায়জাত[২০]। ফলে হাফিজদ্দির মনে ওই সময়ে ফুলের প্রতি ভিন্ন ধরনের আবেগ জাগ্রত হয়েছে, সেটি হয়ত স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তার কাছে। কিন্তু ফুল দিয়ে স্ত্রীকে ভালোবাসাটা হয়ত

তার কাছে ঈষৎ লজ্জার ব্যাপার, অথবা স্বামী(প্রভু) হিসেবে স্ত্রীর কাছে নত হওয়ার ব্যাপার কিংবা সে ফুলটি তৎক্ষণাৎ দিতে চায়নি আবেদাকে, অপেক্ষা করছিলো একটি মুহূর্তের, যখন বুকের ভেতর জ্বালা উঠবে স্ত্রীকে কাছে পাবার। কাজেই ভবিষ্যতের ভালোবাসার নিদর্শনকে বাঁচিয়ে রাখতে বোতলে ভিজিয়ে রাখতে চায় সে।

অন্যদিকে আবেদার মানসগড়ন শহীদুল জহির এঁকেছেন ভিন্ন উপকরণে, এদেশীয় নারীর প্রত্নচৈতন্যের[২১] বৈশিষ্ট্য মতোই সে পতিভক্ত। তবু পরের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করা আবেদার মন খানিকটা শাহরিক অন্দরমহলের বাসনামোড়া। তাই সে স্বামীকে ভয় যেমন পায় তেমনি আকাঙ্ক্ষা করে তার রোমান্টিক স্পর্শের, সিনেমার নায়িকাদের মতো নায়কের আকস্মিক সুখস্পর্শের চিন্তা তার মনে জেগে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই[২২]। তাই তাকে ডাকার পর হাফিজদ্দিকে যখন সে ফুল হাতে ঝুপড়িতে ঢুকতে দেখে তখনই তার মনে হয় "খেপলো নাকি লোকটা। নইলে দিনদুপুরে ফুল হাতে করে বাড়ি ফিরল যে মরদ! আর ওকেইবা ডাকল কেন? ঘরে ঢুকতেই সিনেমার নায়কদের মতো খোপায় পরিয়ে দেবে না তো আবার?"[২৩]

এই ভাবনার সঙ্গে শহুরে রুচির সঙ্গে বেখাপ্পা বিষয়টিও ভাবনায় আসে তার। ডাক শুনে তাই পানি ঢালা ভিজা চুলগুলো সে খোঁপায় গুছিয়ে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গেই "আঁশের মতো পাতলা আর তেলহীন রুক্ষ চুলগুলোর কথা ভেবে ওর মন খারাপ হয়। যে ছিরি চুলের, এই চুলে কি ফুল মানায়?"[২৪] কিন্তু আবেদার এই কিঞ্চিৎ শহুরে ভাবনার সঙ্গে হাফিজদ্দির অমার্জিত ভাবনার সংশ্লেষ সংঘাতপূর্ণ, ফলে আবেদার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, হাফিজদ্দি কোনোভাবেই সিনেমার নায়কের মতো আচরণ করে না। বরং তার মন বিক্ষিপ্ত হয় আবেদার চুল ঝাড়া পানিতে। সে চলে গেলেও আবেদার মনে উদ্ভূত প্রেমবাসনা জিইয়ে থাকে, ফুলকে ঘিরে তা হয়ে ওঠে ঘনায়ত। তাই "হাফিজদ্দি চলে গেলে বোতল থেকে ও ফুলটা উঠিয়ে নেয়। আঙুল বুলায় অনেকক্ষণ। চুল খোপা করে তাতে গুঁজতে চেষ্টা করে। ভারি ফুল বারে বারে খসে পড়ে। শেষে হাত দিয়ে খোপার পাশে চেপে ধরে ও ছোট আয়নায় নিজেকে দেখে। ঘরের অন্ধকারে দেখে ওর তৃপ্তি মেটে না। বাইরে আলোয় যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাইরে যাওয়া যাবে না, চারিদিকে লোক, জানে ও।"[২৫] আবেদা সংবরণ করে নিজেকে। কিন্তু মনের মধ্যে যে কেয়ার কাঁটা বিঁধে আছে তার প্রচ্ছন্ন বেদনাতিক্ত সুখ থেকে যায় মনের গহীনে, আসন্ন সন্ধ্যায় হাফিজদ্দিকে ঘিরে আবার জেগে ওঠে তা। ভিজিয়ে রাখা ফুলে তার জড়িয়ে যাওয়া চুল হাফিজদ্দির কাছে প্রমাণ করে ফুলের প্রতি তার জমে থাকা অনুরাগ। সেই অনুরাগেই হয়তো সুপ্ত প্রীতিবাসনা উদ্দীপিত হাফিজদ্দির মনে। অমার্জিত কণ্ঠে কোমলতার বাহুল্য ছাড়াই তাই সে আবেদাকে আচানক বলে "ফুলটা তরে দিয়া দিলাম যা।" হাফিজদ্দির গলায় কোনো কোমলতার কাঁপন নেই তবু এই বাক্য শুনে কী এক সুখে আবেদার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে।

এ যেন সিনেমার নায়কের মতোই এক আকস্মিক আচরণ, যার মোহময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আবেদা পরম সুখে চুমু খায় সন্তানের কপালে।

অভিন্ন জীবনের যাপন পদ্ধতি, একই সমান্তরাল রেখায় অবস্থান দুজনের, তবুও স্বপ্নের লালন ও পূরণের প্রকল্পনায় পৃথক দুজনায়। খানিক নগরজীবনের অভ্যন্তরের অভিজ্ঞতা[২৬] আবেদাকে ঈষৎ-মার্জিত সিনেমাটিক স্বপ্নে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু কিঞ্চিৎ দূরত্বের ব্যবধান হাফিজদ্দিকে ওই আচরণে ইতস্তত করে তোলে। তবুও ভালোবাসার জাগরণে দুজন একে অপরের আকাঙ্ক্ষী, তবুও যে কোনো রূপে ভালোবাসার প্রকাশে দুজনে সমান আগ্রহী।

শুধু স্বপ্নের বিভোরতা ও প্রকাশের বৈচিত্র্য নয় শহীদুল জহির আবেদা-হাফিজদ্দির সমাজের উৎপাদন কাঠামোগত অবস্থানও নির্দেশ করেছেন তাদের পেশা, বাসস্থানের মান ও রুচির প্রকাশপদ্ধতির মাধ্যমে[২৭]। সাধারণ বস্তিবাসীর সাদাকালো জীবনে চর্চিত নাগরিক রঙের ছটা নেই, হাফিজদ্দি রাস্তার পাশের পান-সিগারেট বিক্রেতা, আবেদা পরের বাসার ঠিকা ঝি। যাদের মনে পুষ্পিত হয় নি শিক্ষার সুন্দরম বোধ, রুচি ও স্বপ্নের প্রকাশ তাদের অপরিশীলিত, অবিন্যস্ত। তাই মনের মধ্যে হঠাৎ জেগে ওঠা ভালোবাসার বিস্ময় হাফিজদ্দি গুছিয়ে প্রকাশ করতে ব্যর্থ, ফুল নিয়ে এসেও স্ত্রীর খোঁপায় গুঁজে দেবে কি না সে ব্যাপারে ভাবনাহীন, পরিকল্পনাশূন্য। এমন এক মানবেতর পরিপার্শ্ব নিয়ে তাদের বেঁচে থাকা, যেখানকার প্রতিটি দৃশ্যই হয়তো নাগরিক সুরুচিতে অগ্রাহ্য। তবুও সেই বাস্তবতা গায়ে-মনে সয়ে যায় তাদের; একটি বর্ণনায় শহীদুল জহির তুলে ধরেছেন তা:

> একটা কে যেন উপুড় হয়ে কলের কাছে মুখ নিয়ে মুখ ধুচ্ছে – পিছন থেকে শুধু একটা বিশেষ ভঙ্গি দেখা যাচ্ছে। করম আলীর কিশোরী মেয়েটা একটা ইটের উপর কি যেন একটা কাচছে। ওর কাছেই আবেদা দুটো জড়ো করা ইটের উপর বসে পিঠ উদোম করে ঝামা দিয়ে কালো গা মাজছে। এ ধরনের দৃশ্য হাফিজদ্দির গা সওয়া হয়ে গেছে।[২৮]

ছোট্ট একটা দৃশ্য, কিন্তু অনেকটা বিস্তারিত, অনেকটা অনুপুঙ্খতার স্বাক্ষর রেখে বর্ণনা করেছেন গল্পকার। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কিংবা হাসান আজিজুল হকের সানুপুঙ্খতার (Detail) রেশ যেন এর স্তরে স্তরে প্রতিফলিত। তদুপরি চরিত্রগুলোর ভাষা ও শব্দের ব্যবহারে লেখক তাদের করে তুলেছেন প্রাণবন্ত। বলা যেতে পারে চরিত্রের যাপিত অভিজ্ঞতা এবং পরিপার্শ্ব ভাষার রূপায়ণে যে প্রবল ভূমিকা রাখে এবং নির্ধারণ করে দেয় তাদের উচ্চারণ-প্রকৃতি, এই বিশ্বাসে শহীদুল জহির যেন প্রথম গল্পটি থেকেই অভ্যস্ত। 'পারাপার' গ্রন্থের এই গল্পটির চরিত্রগুলোর মধ্যে পুরান ঢাকার ডায়ালেক্ট ব্যবহারের সচেতনতা শহীদুল জহিরের সেই সচেতনতাকেই প্রকাশ করে। বাস্তববাদী ঘরানার সাহিত্যশৈলী হিসেবে চরিত্রের

চারিত্র্যনিষ্ঠ ভাষা ব্যবহারের যে প্রবণতা চর্চিত হয়ে আসছিল বিশশতকের তিরিশের দশক থেকে, বাংলাদেশের আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পুরান ঢাকার ভাষায় তা পেয়েছিল সুতীক্ষ্ণ-সুমিষ্ট ব্যঞ্জনা; শহীদুল জহির সেই ব্যঞ্জনার আস্বাদ সংশ্লিষ্ট করেছেন তাঁর প্রথম গল্পেই। হাফিজদ্দি-আবেদা-মওলা প্রভৃতি চরিত্র এই গল্পে সবাক হয়ে উঠেছে নগর ঢাকার ঐতিহ্যমিশ্রিত সুরেলা স্বরেই। এই সুর আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে পরবর্তী গল্প 'তোরাব সেখ'-এর মধ্যে।

'পারাপার' গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'তোরাব সেখ'। তোরাব সেখ শহীদুল জহিরের অস্তিত্বকামী ব্যক্তিত্ববোধজাগর চরিত্র নিয়ে লেখা অসাধারণ গল্প। এক বিরুদ্ধ প্রতিবেশের বর্ণনায় গল্পের শুরু করেছেন গল্পকার, আবহাওয়া জীবনের প্রতি বিরূপ, বিরূপ সমাজও। উচ্চ স্তরের মানুষের গাড়ির ধোঁয়া আর ধুলা লাঞ্ছনাবোধ জাগ্রত করে তোরাবের মনে[২৯]। কিন্তু সঙ্গী পায়না সেটি জিইয়ে তোলার। কারণ কর্মব্যস্ত জীবনের টানে বস্তির সব বাসিন্দাই চলে গেছে কাজে, ফলে সে দেখতে পায় – "একটা লোকও নেই সারা বস্তিতে, যে এই চরম লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে ওর সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে পারে। জোয়ান মেয়ে মরদ সব বাইরে। কিশোর কিশোরী এমনকি তোরাবের ত্রিশ বছরের প্রায় অথর্ব সঙ্গিনীটি পর্যন্ত।" এমতাবস্থায় সংকট ঘনীভূত হয় তোরাবের, নিজেকে বাতিল মনে হয়, "তোরাবের খারাপ লাগে রোগকাতর বুড়ো হওয়ার জন্য।" বয়সের আয়নায় দেখা নিজের রিক্তরূপ তাকে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, তাই সে "শিরা ফুলে ওঠা গিঁটলো আঙুলগুলো ফোটায় টিপে টিপে। বাহুর ঝুলে পড়া শিথিল পেশিগুলো ফুলাতে চেষ্টা করে। ফুলিয়ে শক্ত গুলটি বানাতে চেষ্টা করে। কিন্তু জীর্ণ পেশি কাঠিন্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।"[৩০] তবে তাতে আশাহত হয় না তোরাব, কারণ প্রাণের স্পন্দন ছুঁয়ে যায় তাকে এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে, ফলে সে "প্রফুল্ল বোধ করতে চেষ্টা করে।"[৩১] এই প্রফুল্লতার চেষ্টা নিজেকে নিজের কাছে কর্মক্ষম ভাবায়, নিজে সে নিজেকে অবহেলিত বা পতিত ভাবতে নারাজ, তাই তো প্রতিবেশী নিজামের সঙ্গে ঠেলা বওয়ার সুযোগ চায়, মনে সাধ– পড়ে থাকবে না সে অন্যের গলগ্রহ হয়ে। তাই নিজাম যখন তোরাবকে পরের দিনে কাজে আমন্ত্রণ জানায় এবং সংশয় প্রকাশ করে বলে যে, "অনেক দূরের খ্যাপ কইলাম। এই দূরের মইদ্দে কুলাইবার পারবা তো।"[৩২] তখন সেই সন্দেহ তোরাবের অহমে আঘাত করে, উঁচু স্বরে সে জানায় আপত্তি, "পারুম না কি অইছে! ওর বার্ধক্যের প্রতি নিজামের ইঙ্গিতে ওর ক্রুদ্ধ গলার শিরা কাঁপতে থাকে উত্তেজনায়।"[৩৩]

এই ব্যক্তিত্ববোধে ভাস্বর তোরাব গল্পের শেষাবধি নিজের প্রতি থাকে বিশ্বস্ত। সেই বিশ্বাস থেকেই সে নিজের পিতৃত্ব-চেতনায় মুখর হয়, কন্যার মঙ্গলচিন্তায় প্রকাশ করে নিজের মতামত। কন্যা লালবানুর সজ্জায় তাই দৃষ্টি দেয় তোরাব সেখ। লালবানু যখন খুলে রাখে কানের দুল তখন সে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে, মনে মনে সন্দেহ করে পিতার মতোই, সন্তান বুঝি কোনো অবৈধ পন্থায় অর্জন করেছে কানের দুল,

সন্দেহ থেকেই জিজ্ঞাসা করে "চুরি করস নাই তো?"[৩৪] এ যেন সন্তান বেপথু হয়ে যাবার সংশয় ঝরে পড়ে তার মুখ থেকে। কিন্তু সংসারের অন্য সদস্যদের কাছে জমা থাকে তার জন্য বিরক্তিবোধ, ভালো হয়তো তারা সকলেই বাসে তাকে, কিন্তু অশিক্ষিত-অমার্জিত শ্রেণির মুখে গোছানো ভালোবাসার বাক্য ঝরে না কোনোদিন। তারা হয়তো এই বয়সের তোরাব সেখকে সাংসারিক ঝামেলায় জড়াতে চায় না আর। তাই তার সন্দেহের বিপরীতে তার স্ত্রী রহিমা ক্ষেপে উঠে বলে, "এমুন কতা হুনায়ো না তুমি, চুরি করে না কোন সাবে?"[৩৫] কিন্তু তোরাব সাহেবদের সাথে পাল্লা দিতে চায় না, সে চায় সন্তান তার সৎ থাক, সুন্দর থাক; হয়তো সেই চেতনা থেকেই বলে, "সাবগো কতা আমারে শুনাইছ না তুই।"[৩৬]

একপ্রকার ব্যক্তিত্বভাস্বর দায়িত্ববোধের তাড়নাতেই তোরাব সেখ চালিত হয়, তাই প্রচণ্ড খাটুনি হলেও "এই দুর্দিনে সংসারে কয়েকটা টাকা যোগ করতে পারায় ওর মনে তৃপ্তির একটা ফুল্ল ধারা বয়ে যায়। ক্ষণকালের জন্য গ্লানি বিস্মৃত হয়।"[৩৭] সমকালের অর্থনীতিতে উৎপাদক হিসেবে বাজারে যে তার মূল্য কম সে ভাবনাও তার চিন্তাসূত্রে গ্রথিত, কর্মক্ষম পুরুষের বিপরীতে নিজের অবস্থানও তার জানা আছে "কিন্তু ও পুরুষ নয়, বুড়ো। পুরুষ মানুষেরই প্রত্যেকদিন কাজ জোটে না, বুড়োদের জুটবে কোত্থেকে!"[৩৮] আবার "প্রত্যেকদিন ভারি মালের খ্যাপ থাকে না। তাই বাড়তি সাহায্যকারীর দরকার হয় না নিজামদের।" তাই "তোরাবের মনে কর্মহীন আগামীকাল গ্লানিকর ঠেকে।"[৩৯]

এই কর্মবোধজাগর কর্মী, আত্মজাগর পিতা তোরাব পরিবারে নিজের অবস্থানগত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চায় ব্যাপকভাবে। সরাসরি দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির মুখোমুখি সে হয় যখন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলে তার মতামতের বিরুদ্ধে লালবানুকে বিয়ে দিতে চায় মজিদ মিয়ার সাথে। এখানেই প্রকট অস্তিত্বহীনতার মধ্যে পতিত হয় তোরাব, সবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন স্নেহশীল দায়িত্ববান পিতার কণ্ঠ জেগে ওঠে তার মধ্যে, তার দৃষ্টিতে দোজবরে শয়তানতুল্য মজিদ কোনোভাবেই লালবানুর যোগ্য নয়, তাই সে যখন জানতে পারে যে, শুধু পুত্র নয়, স্বয়ং কন্যাও সে বিয়েতে রাজি তখন অভিজ্ঞতার প্রাবল্যে কিংবা জনকের অহমপ্রাচুর্যে উচ্চ হয় তার কণ্ঠ — "লালু রাজি হওনেও কুনো কাম অনব না।" ..."আমি বাইচ্চা থাকতে খালি পয়সার লালচে ওই কুত্তার ঘরে লালুরে পাঠামু না।"[৪০]

কিন্তু বাইরের কাজ সেরে কন্যা লালবানু যখন ঘরে ফেরে তখন কন্যাকে দেখে তোরাবের মনে বাস্তবতা অদ্ভুত খেলায় মেতে ওঠে, নিজের পারিবারিক অবস্থান স্পষ্ট হয় তখন, "তোরাব মেয়েকে দেখে। ওরও কেমন যেন ভয় লাগতে থাকে লালবানুকে। তোরাব অনুভব করে লালবানু বড় হয়ে গেছে। কিশোরী থেকে দ্রুত যুবতী হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারে, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়ার মতো শক্তিও লালবানু

অর্জন করে ফেলেছে। সে কোনোভাবেই তোরাবের হাতের মুঠোয় নেই। সে তো তোরাবের পোষ্য নয়। বরং তোরাবই ওদের পোষ্য। তোরাবের কেমন দুর্বল লাগে।"[৪১] তবুও পিতা কন্যাকে বোঝায়, দেখায় ভয়। কিন্তু "লালবানু তোরাবের নির্দেশ মেনে নেয় না। তিন দিন পরেই ও পালায়।" পরিবারের অন্য সবার যোগসাজশ থাকলেও তোরাব জানতে পারে না কিছুই, পরিবার তাকে করে রাখে বিচ্ছিন্ন। তারপর ঘটনার দিন যখন লালবানু সময় মতো ঘরে ফেরে না, পিতার চিত্ত কেঁপে ওঠে শঙ্কায়। তদুপরি পুত্র জমির যখন জানায় "লালু আর আইব না।" তখন "তোরাবের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ঝিমঝিম করে কপালের স্ফীত শিরাগুলো। ওর ইচ্ছে হয় জমিরের গলার গিঁটটা কামড় দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে। ঘরদোরে আগুন ধরিয়ে দিতে।"[৪২] এই পরিবারে তার অস্তিত্বশূন্য অবস্থান পরিষ্কার হয়ে যায় দৃষ্টির সম্মুখে। সবাইকে বের করে দিতে চায় ঘর থেকে। কিন্তু চাইলেই তো আর পারা যায় না। তার মতো আয়শূন্য মানুষের পক্ষে সে চাওয়া অনেকটা ধৃষ্টতা। জমির সেই বাস্তবতা আরও স্পষ্ট করে দিয়ে বলে–"এই ঝুপড়ি তোমার নামে এলুট, আর ভাড়া দেয় এই জমির‍্যা। তুমার খারাপ লাগলে তুমি যাও গা।"[৪৩] বহুদিনলালিত স্বপ্নবাগানতুল্য সংসার থেকে এভাবে বিতাড়ন হয়ত সহজে মানতে পারে না তোরাব, পুত্রের শেষ সিদ্ধান্ত জানার জন্য চিৎকার করে ডাকে পুত্রকে "আমার কতা হুইনা যা জমির, আমার কতা হুইনা যা।" কিন্তু পুত্র চলে যায়, ক্রমভঙ্গুর মানসিকতার পিতার দিকে ফিরেও তাকায় না। তাই "সারাটা মন ওর বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। বলে, তগো মুখ আমি দেকবার চাই না।" তারপর "তোরাব অন্ধকারে হারিয়ে যায়।"[৪৪]

ক্রমেই ভেঙে পড়া অহমের পরাক্রমী বিচ্ছিন্নতাবোধ তোরাবকে আড়াল করে দেয় পরিচিত বলয় থেকে। প্রতিদিনকার সাধারণ মান-অভিমানের মানদণ্ডে বিচার করে পরিবারের সদস্যরা অপেক্ষায় থাকে তার প্রত্যাবর্তনের, দিন যায়, সবাই উৎকণ্ঠিত হয়। একদিন জমিরও কেঁপে ওঠে বুকের ভেতরকার বেদনায়, "জমিরের বুকের ভেতর একটা কষ্ট হয়, বুড়োটার জেদের কাছে পরাজয়ের কষ্ট। সে আশা করে তোরাব এসে পড়বে, এসে দাঁড়াবে, আর সে বলবে, আহন লাগল তো, কেমুন!"। কিন্তু স্বপ্ন তার স্বপ্নই থেকে যায়। "দিনের প্রান্তে রাত এসে দাঁড়ায়। রাতের শেষে দিন ঘুরে আসে। কিন্তু তোরাব আসে না। রহিমা চেপে কাঁদে। জমির কষ্ট আর বুকে আশা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তোরাব আসবে। শালার বুইড়া আগে ফিরা আহো একবার – তোরাব আসে না।"[৪৫]

এই চিরন্তন অপেক্ষার শুরু দেখিয়েই গল্পের শেষ টেনেছেন গল্পকার শহীদুল জহির। পরিবারের সদস্যরা যেন হেলায় হারিয়েছে 'পরশ পাথর', যেন তারা 'গডোর প্রতীক্ষায়' তাকিয়ে আছে ভবিষ্যতের দিকে। তবে এই অপেক্ষা প্রদর্শন শহীদুল জহিরের একক লক্ষ্য নয়, তোরাবের ব্যক্তিত্বের বিপরীতে বিরুদ্ধ বাস্তবতা এবং অহমসম্পন্ন ব্যক্তির ক্রম অপসৃয়মাণ হয়ে যাওয়ার এক অস্তিত্ববাদী গল্পের ছক

অঙ্কনও তাঁর ঈপ্সা। উন্মুল-ভাসমান জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবনের মর্মমূলের বাস্তবতা দেখিয়ে সেখানে তিনি তোরাবের মতো চরিত্র কল্পনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কীভাবে বিরুদ্ধ প্রতিবেশ তাকে বাধ্য করে অস্তিত্বশূন্যতায় বিলীন হয়ে যেতে। 'তোরাব সেখ' সেই শূন্য অস্তিত্বের গল্প।

গ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'পারাপার'। নিপুণ ভঙ্গিমায় চৈতন্যপ্রবাহরীতির মুগ্ধকর ব্যবহার সহজেই এ-গল্পের লেখককে ওয়ালীউল্লাহ্-ইলিয়াসের উত্তরসূরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। উপরন্তু 'পারাপার' গ্রন্থের এ-নামগল্পটি মার্কসীয় শ্রেণিদ্বন্দ্বের সার্থকতম উদাহরণ। তিনটি শ্রেণির[৪৬] প্রতিনিধি এ-গল্পের কেন্দ্রকে রেখেছে উজ্জীবিত। সমাজকাঠামোর চূড়াস্তরের সঙ্গে নিম্নস্তরের যে সংঘাত এ গল্পের শেষাংশে দেখা দেয়, গল্পের শুরু থেকে তাতে সংযোগের কাজ করে মধ্যস্তরের এক প্রতিনিধি। স্তরায়িত সমাজকাঠামোর মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে আগত চরিত্রটির চৈতন্যের দ্বান্দ্বিকতা এ-গল্পের মূল উপজীব্য। ওলি নামের চাকরিপ্রত্যাশী এক স্বাপ্নিক মধ্যবিত্ত চরিত্রের একটি দিনের জীবনাভিজ্ঞতা নিয়েই আবর্তিত হয়েছে গল্পটির কাহিনি।

শিক্ষিত বেকার যুবক ওলির চিটাগং থেকে চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে ফেরার পথে 'পারাপার' গল্পের শুরু। সিরাজগঞ্জ জেলার কোনো মফস্বল বা গ্রামের এই যুবক রোমান্টিক স্বপ্নচারী, মধ্যবিত্তীয় রুচির সঙ্গে অভ্যস্ত। বেকার অবস্থার এক নেতিবোধ তার মনে মাঝে মাঝে ক্রিয়াশীল, একই সঙ্গে তার মনে চায় নিজের শ্রেণি থেকে উত্তরণ পেতে কিন্তু একটু নিম্নশ্রেণির প্রতি মমত্ববোধও তার মনে স্বতঃস্ফূর্ত। এই ধরনের রূপান্তরকামী মনস্তত্ত্বের দ্বিধাগ্রস্ত আচরণ এই গল্পের মূল অনুঘটক[৪৭]।

ওলি হয়ত মাটিলগ্ন উৎপাদনসম্পৃক্ত সমাজের উত্তরাধিকার, তার চেতনায় বহমান মাটির গন্ধ, কিন্তু শিক্ষার আলো তাকে শ্রেণি পরিবর্তনের যোগ্যতা দান করেছে, মার্জিত বোধ তাকে দিয়েছে রোমান্টিক কল্পক্ষমতা। এ-দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে শিশুশ্রমিক আবুল ও বশিরের পক্ষ নিয়ে শেষপর্যন্ত সে নিজের উৎসমূলের কাছেই ফিরে যায়। বুর্জোয়া-প্রতিনিধির শোষণের প্রতিবাদে ফেটে পড়ায় তার শ্রেণিগত অবস্থান নির্ণিত হয়, দ্রোহের শক্তি তাকে বিদ্রোহীতে পরিণত করে।

চিটাগং থেকে চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে ট্রেনে ফেরার সময় ওলিকে যমুনার জল পাড়ি দিতে হয় জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে এসে। এই ঘাটেই 'পারাপার' গল্পের শুরু। নিজের জিনিসপত্র তেমন নেই ওলির যা কুলি দিয়ে পার করাতে হয়, কিন্তু "সাহেব সাহেব ধরনের বয়স্ক চেহারার" এক লোক যখন তার দুটো বেডিং রেখে যায় ওলির তত্ত্বাবধানে তখন সে আপাতত মালিক বনে যায়। জুটে যায় দুটি শিশু 'কুলি' পরিচয়ে। তারা অর্থ আয় করতে চায় মোট বহন করে। ওলি তাদের কাছে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। কিন্তু শিশুর বায়না থামে না। অগত্যা আরও একটা দায়িত্ব নিয়ে নেয় সে। বেডিংয়ের মালিককে সে রাজি করাবে যেন তাদের দিয়েই মাল বহন

করায় সে। পারিশ্রমিক ঠিক হয় তিন টাকা। তারপর জমে ওঠে আলাপ। তাদের মানবেতর জীবন-কাহিনি ও ঘাটের নিয়মিত কুলিদের অত্যাচারক্লিষ্ট বর্তমান বাস্তবতা আহত করে ওলিকে, সে চায় এমন কিছু করতে যা তাদের দেবে আপাত নিশ্চিত জীবনের অধিকার। তাই ভবিতব্যের কল্পনা খেলে যায় ওলির কল্পপটে– "ওলি ওর চাকরিটির কথা ভাবল। রেলের চাকরি টিকিট চেকারের। চাকরিটা হবে কি? যদি হয়, আর যদি ওকে ঘাটেই নিয়োগ করা হয় তাহলে ও ছেলে দুটোর জন্য কিছু একটা করবে।"[৪৮] এই কল্পনা ও ইতিবোধ ওলিকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে আবুল ও বশির নামক কুলিশিশু দুটির। উঠতি মধ্যবিত্তের এ যেন সহজাত বৈশিষ্ট্য, অপেক্ষাকৃত নিম্নের প্রতি অনুরাগ, তার পক্ষাবলম্বন এবং উচ্চবিত্তের দার্ঢ্যের প্রতি বিরাগ। বিরাগ এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ পায় না এ গল্পে, শোষণের মাত্রা যখন ছাড়িয়ে যায় সহ্যের সীমা, দরিদ্রের সৌন্দর্য তখন বিদ্রোহে প্রকাশ পায়।

ওলিও এ গল্পে ফেটে পড়ে শেষের দৃশ্যে, তার আগে জমতে থাকে ক্ষোভ। সাহেব লোকটি, যে কি না উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা,[৪৯] সে এসে যখন সহজে গ্রহণ করতে চায় না ওলির প্রস্তাব, মেনে নেওয়ার আগে দরদাম করে শিশু দুটির সঙ্গে এবং মমতাবিবর্জিতভাবে মজুরিতে ঠকানোর চেষ্টা করে, ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে তখনই। ওলির মনে হতে থাকে "ও কি অসহায়। কী বীভৎস রকমের ফাঁপা।" এছাড়া লোকটির আচরণে যখন তার প্রতি এক রকম ঘৃণাভাব ফুটে ওঠে, যেমন ফুটে ওঠে মানুষের দালালদের প্রতি, সেটি লক্ষ করে "ওলি বুকের ভেতর একটা বিশ্রী যন্ত্রণা অনুভব" করে। "এক দুর্বোধ্য অপমানের ক্ষত" চাটতে থাকে সে। এরপর যখন আবুল লোকটার একটি বেডিং ফেলে দেয় নদীতে অপারঙ্গমতাবশত এবং লোকটা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আবুলকে বেঁধে ফেলে তখন সে আবুলের পক্ষে এগিয়ে কথা বলতে এলে নিজেই তীব্রভাবে হয় অপমানের শিকার। লোকটি তাকে স্পষ্টভাবে দালাল বলে অভিহিত করে, "ওর হৃৎপিণ্ডটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে" যায়। নিজের অস্তিত্ববোধ চলে যায় শূন্যের সীমায়, ধূমায়িত হতে থাকে ক্ষোভ। পরে ঘটনার জের ধরে লোকটি যখন নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের পাশাপাশি ওলিকে ধরাশায়ী করে স্কাউন্ড্রেল বলে ওলির গালে কষে দেয় চড়, তখন চোখের জল নেমে আসে ওলির, ফানুসের মতো মার্জিতভাবের মধ্যবিত্তীয় কেতাবি খোলস ভেঙে যায় তার, অস্তিত্বের চরমসংকটে ফেটে পড়ে ক্ষোভে।[৫০] ক্ষোভের অনল উত্তপ্ত করে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে, সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে দেহের সর্বত্র, চকিতে ধরাশায়ী করে ফেলে আগ্রাসী শোষককে। লেখক এই অংশের বর্ণনা করেছেন অনন্য অনুপুঙ্খতার সঙ্গে: "ওলি ঠোঁটে নোনা পানির স্বাদ পেল। চকিতে বোধ আর বোধহীনতাকে তুচ্ছ করে, একটি অনুজ্ঞা রক্তের ভেতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহের মতো দ্রুত শরীরের সর্বত্র, আঙুলের ডগায়, চোখের তারায়, হাতের পেশিতে সঞ্চারিত হয়ে গেল। আঙুলের ডগা গুটিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল, চোখের তারায় দুপুরের রোদ খেলে গেল, হাতের পেশি চিতার

মতো তৈরি হয়ে গেল। ওলির ডান হাতের মুঠটা লোকটার চোয়াল স্পর্শ করল। ছিটকে পড়ে গেল লোকটা।" তার এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ মুক্তির কারণ হলো আবুলের, ওলি হয়ে গেল শোষিত-শ্রমজীবীর মুক্তির দূত, কেননা, লোকটি ছিটকে পড়ার সাথে সাথে "নিজেকে ছাড়িয়ে মুক্ত করে নিল আবুল, দৌড় দিল ফ্লাট পার হয়ে স্টিমারের পেছন দিকে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যমুনার কালো ঘোলা পানিতে।"[৫১]

চরিত্রের স্বপ্ন, অভিরুচি, ক্রিয়াকলাপ সবকিছুতেই শহীদুল জহির শ্রেণিচেতনার সাক্ষ্য রেখেছেন গল্পটিতে। মার্কসীয় বিবেচনায় সমাজের যে দুটি স্তর দেখা যায় তার প্রত্যেকটি স্তরের প্রতিনিধি এই গল্পে উপস্থিত। নিম্নস্তরে রয়েছে উৎপাদন ও মজুরির সঙ্গে সম্পৃক্ত সর্বহারা আবুল ও বশির, মধ্যস্তরে ওলি এবং উচ্চস্তরে সরকারি কর্মকর্তা সেই লোকটি, যে শাসনের সঙ্গে যুক্ত, ভোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং শোষণ যার অস্তিত্ব টিকেয়ে রাখার হাতিয়ার।

চরিত্রের শ্রেণিগত বিন্যাসের সাথে সাথে শহীদুল জহির প্রতিন্যাস করেছেন তাদের চারিত্রিক মৌলপ্রবণতাসমূহ। দেখিয়েছেন প্রতিটি স্তরের চরিত্রের পরিবর্তমান আকাঙ্ক্ষার প্রন্যাস। মার্কসীয় সূত্রমতেই প্রতিটি স্তরের চরিত্র স্তর-উত্তরণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তৎপর। ছিন্নমূল, মৃত্তিকালগ্ন কুলিশিশু আবুল ও বশির তাদের দুর্দিন ঘুচিয়ে পেতে চায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, তাই তারা স্বপ্ন বাঁধে ওলিকে কেন্দ্র করে, তার কাছেই আবদার চায় মেটাতে। তারা ওলির মাধ্যমে নিজের নিজেদের সুদিন আনতে পারবে এমন বিশ্বাসে আস্থা রাখে ওলির ওপর। মনে-প্রাণে প্রার্থনা করে যাতে ওলির চাকরিটা হয়। কেননা ওলি তাদের সুন্দর দিনের নিশ্চয়তা দিতে চায়। অন্যদিকে রূপান্তরকামী ওলিও হয়ে উঠতে চায় নিপীড়িতের নেতা। সদ্য বিবর্ধমান মধ্যবিত্তের খোলসে আবদ্ধ ওলি মাঝে মধ্যে মধ্যবিত্তের পলায়নপরতায়ও আক্রান্ত হয়, কখনও কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে বাঁচিয়ে পালানোর চেষ্টাও দেখা যায় তার মধ্যে। শিল্পপদ্ধতির হিসেবে আশির দশকের লেখক এইখানেই নিজের স্বকীয় দৃষ্টি আর প্রাক্তনের[৫২] প্রকাশভঙ্গির[৫৩] সংযোগ ঘটিয়ে ফেলেন, সৃষ্টি করেন নতুন মাত্রার।

আবার এ-গল্পে শিক্ষিত যুবকের আত্মপ্রদর্শনের অহমও পরিচালিত করে তাকে। তাই সরকারি লোকটি যখন ওলির কাছে বেডিং রেখে ফিরে আসার সময় দুজন অল্পবয়স্কা মেয়ে নিয়ে আসে, তাদের সামনে সে নিজের রুচিশীল মার্জিতভাব তুলে ধরার চেষ্টা করে — "ওলি দেখল মেয়ে দুটোকে নিয়ে লোকটা ফিরে আসছে। ও হঠাৎ ভীষণ উত্তেজনা অনুভব করল। উঠে দাঁড়িয়ে একটু হেঁটে গিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। গভীর করে দম নিল। আঙুল ফোটাল।"[৫৪] আবার আবুলকে ধরে ফেলার পর সে যখন তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যায় তখন সরকারি লোকটি তাকে সম্বোধন করে "আপনি সেই দালালটা না?" এই কথা শুনে বা চ্যালেঞ্জ শুনে সে

হকচকিয়ে যায়, বিভ্রান্ত হয়। এই বিভ্রান্তি মধ্যবিত্তের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিপ্লবের মধ্যেও কার্যকর থেকে তা কখনও কখনও করে দিতে পার নস্যাৎ। তাই এই বিভ্রান্তির মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুতের মতো খেলে যায় পিছিয়ে যাওয়ার চিন্তা– "ওলির হৃৎপিণ্ড চাবুক খেয়ে এক মুহূর্ত যেন থেমে থাকল। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। ও সরে পড়তে চাইল। ওর মনের ভেতর থেকে কেউ, বোধ হয় যুক্তি, বুদ্ধি, ওকে জানাল সরে পড়াই ভালো।"[৫৫] এবং বিধ বৈশিষ্ট্যসমেত ক্যানভাসেই শহীদুল জহির স্তরায়িত সমাজের প্রতিনিধিদের চরিত্রচিত্রণ করেছেন এবং এক স্তর থেকে অস্তিত্বের প্রয়োজনে আরেক স্তরে উত্তরণ দেখিয়ে স্তর থেকে স্তরে পারাপারের গল্প ফেঁদেছেন। তাঁর এই গল্পবীতংসের নাম 'পারাপার'।

তিনটি শ্রেণির প্রতিনিধিদের মুখের ভাষা প্রদানেও লেখক রেখেছেন মনোযোগের স্বাক্ষর। নিম্নশ্রেণির আবুল ও বশির এখানে একেবারেই মৃত্তিকাগন্ধী শব্দ ব্যবহারে প্রোজ্জ্বল। শোষকের ভাষা মার্জিত বুর্জোয়া ছাঁচের তৈরি। কিন্তু ওলির শব্দ ব্যবহারে রয়ে গেছে দ্বিধাসিক্ত দ্বিচারিতা। সে আবুল-বশিরের শব্দে প্রাণোচ্ছল এবং সরকারি লোকটার ভাষাকাঠামোর প্রতি সচেষ্ট আগ্রহী। ভাষার এই দ্বিমুখিতা এই প্রকারের সুবিধাবাদী চরিত্রের বিপজ্জনক আচরণ-নির্দেশী। কিন্তু ওলি এখানে স্বয়ং অত্যাচরিত বলেই শেষপর্যন্ত আবুল-বশিরের শ্রেণির সঙ্গে আত্মনিয়োগ করে নিজের অবস্থান তৈরি করতে সচেষ্ট।

দীর্ঘকাল উপনিবেশের কোপানলে দগ্ধ কোনো সমাজে শোষণের ও প্রতিবাদের ভাষা বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে। শোষণের রং যেখানে বহুভঙ্গিম, প্রতিবাদের ভাষাও সেখানে বৈচিত্র্যময়। বাঙালির কৌমসমাজের শোষণভাষণের সেই বৈচিত্র্যদর্শী গল্প শহীদুল জহিরের 'মাটি এবং মানুষের রং' শীর্ষক গল্পটি। এতে শহীদুল জহির এদেশীয় মানুষের সেই সৌন্দর্যবোধকে প্রধান করে তুলেছেন যা বাঙালির হাজার বছরের কৌম-সংস্কার দ্বারা প্রতিপালিত। গল্পকার উত্তর-উপনিবেশী চিন্তাতট[৫৬] থেকে নববিশ্লেষণের ভাবনায় তার উত্তরণ দেখাতে চেয়েছেন। বর্ণবাদী চিন্তা এ গল্পটির অন্তঃকোষে প্রসৃত থাকলেও লেখক মাটিলগ্ন মানুষের জীবন বাস্তবতা, তাদের শ্রেণিচৈতন্যকেও অপ্রধান বিবেচনা করেননি। এ দুয়ের সন্নিবেশনে তাঁর গল্পটি হয়ে উঠেছে দ্বি-স্তরিক পাঠসম্ভব গল্প।

গল্পটি তৈরি করতে গিয়ে শহীদুল জহির উপরিতলে একটি নিতান্ত সাধারণ আখ্যান প্রযুক্ত করেছেন, তার প্রধান চরিত্র আসিয়া বেগম এবং আম্বিয়া খাতুন। দূরাত্মীয় পড়শীকন্যা আম্বিয়া, একসময় তার চাপা সৌন্দর্য-গুণে মুগ্ধ হয়ে পুত্রবধূ করতে চাইলেও এই গরিবদুহিতা আম্বিয়ার গায়ের রঙের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে আসিয়া বেগম পুত্রবধূ করে আনে সাদা-ফর্সা রঙের মেয়ে ময়নাকে, মনের বাসনা এবার ভবিষ্যৎ

বংশধর কালো রং না হয়ে হবে ময়নার মতো সুন্দর গায়ের রঙের। কিন্তু আশাভঙ্গ হয় আসিয়া বেগমের, পৌত্র ফয়জুদ্দি ওরফে ফজু পায় পিতা-পিতামহের গায়ের রং।

অন্যদিকে দূর গাঁয়ের কৃষক জোবেদের সাথে বিয়ে হয় আম্বিয়ার, ঘরে খাবারের কমতি থাকলেও তার কোল জুড়ে আসে রাজপুত্রসদৃশ পুত্র লাল। একদিন বাপের বাড়ি বেড়াতে এসে চাচি আসিয়ার বাড়িতে ঘুরতে আসলে তাদের দুজনের কথোপকথন হয়, সেখানেই এক পর্যায়ে আসিয়া বেগমের কথার সূত্রে হারুর মা যখন আম্বির ছেলের সৌন্দর্য নিয়ে মন্তব্য করে আসিয়া বেগমের সামনে বলে "আমাগো আম্বির কিন্তু পোলা হইছে একখান। বাপে কালা, মায় কালা, পোলাখান অইছে কি সোন্দর! রাজার পোলার লান।"[৫৭] তখন আসিয়া বেগমের অন্তস্তলে নিজের জাত্যভিমান (শ্রেণি বিবেচনায়) জেগে ওঠে এবং পৌত্র ফজুর তুলনায় আম্বির সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে কষ্ট হয়। লেখক বিষয়টি বর্ণনা করেছেন বিশ্লেষণসহযোগে:

হারুর মায়ের "কথায় হয়তো বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না বোঝানোর মতো, তাহলেও ওই সময়টা উপযুক্ত ছিল না প্রশস্তির জন্য। আসিয়া খাতুনের মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একটু আগে তিনি নিজের নাতির নিন্দা করেছেন। ফলে হারুর মার কথাটা তাঁর মনের তল পর্যন্ত চলে গেল। সেখানে একটা ক্ষোভের পাত্র ছিল। হারুর মার কথায় সেটা হঠাৎই ভেঙে পড়ল। আর তখন সেখানে সঞ্চিত ক্ষোভ রাসায়নিক কোনো এক বিষক্রিয়ায় বিষে পরিণত হয়ে নিক্ষিপ্ত হলো আম্বির ওপর।" ফলে স্বীয় অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতেই আসিয়া খাতুনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এই জহরনিক্ষেপ: "ছিনালগো পোলা সুন্দরই অয়।"[৫৮]

এই অযাচিত মন্তব্য এক অগ্নিসম্ভব পরিস্থিতির সৃষ্টি করে গল্পটির এ-পর্যায়ে। এবং শহীদুল জহির এভাবেই গল্পের বাঁক সৃষ্টি করেন। চূড়ান্ত দ্বান্দ্বিকতার উন্মেষ ঘটিয়ে তিনি উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের মনোবাস্তবতা তুলে ধরেন এবং এ পর্যায়ে পরিদৃষ্ট হয় কীভাবে ফুঁসে উঠতে তৎপর হয় কৃষকবধূ আম্বি। আঘাত ততক্ষণ পর্যন্ত সয়ে যায় মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকে তার সসম্মান অস্তিত্ব। এই মন্তব্যে প্রথমে বিমূঢ় হয়ে যায় আম্বি, লেখকের বর্ণনায়–

"আম্বি চমকে গেল প্রথমে। তারপর সে গুটিয়ে যেতে চাইল। ওর দেহ মনের ওপর সকালের কুয়াশার মতো অনুত্তেজনার নিশ্চিত আবরণটি নেমে আসতে চাইল।" কিন্তু সম্ভাব্য বিপন্নতার সামনে রুখে দাঁড়ায় মানুষ, নিজের টিকে থাকাটাকে জানান দেয় সাবলীলভাবে, "তাই আম্বি হেঁচকা টানে সেই আবরণটিকে ছিঁড়ে ফেলল।" তার "বুকের ভেতরটা চকিত ঘূর্ণির তাণ্ডবে সচকিত।" সে বলে যেতে চায় কীভাবে মাঠের মাটি আর সূর্যের রোদ মাটিলগ্ন মানুষের চামড়ার রং বদল করে দেয়, জন্মলব্ধ ত্বক রূপান্তরিত হয়ে যায় ফসলের জন্ম দিতে গিয়ে। তার বক্তব্য যেন কোনো দ্রোহের

ভাবনায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে সাহসী, তাই সে স্বভাববিরুদ্ধ হলেও বলে যেতে থাকে সেই প্রতিবাদের ভাষা, তার "মগজের ভেতর থেকে প্রজ্বলিত আগুনের জিহ্বা বেরিয়ে আসে। বলে, আমার সোয়ামির কুমোরের লুঙ্গি খুইল্লা দিলে বুজার পারবেন আমনেরও এইরম পোলা অইতো পারে। আমার ছিনাল হওন লাগে নাই সুন্দর পোলার লাইগ্‌গা।"[৫৯] আম্বির এই লেলিহান উচ্চারণ আগুন ধরিয়ে দেয় আসিয়া খাতুনের উচ্চাসীন অবস্থানে। নিম্নবর্গের দৃপ্ত প্রতিবাদে যেন কেঁপে ওঠে উচ্চবর্গের অন্তরাত্মা।

একেবারেই সাধারণ দ্বন্দ্বের রূপরেখায় গল্পটি তুলে ধরলেও শহীদুল জহির সেই দ্বন্দ্বের মূল প্রোথিত করেছেন এমন দুটি বিষয়ে, যার ওপরে দণ্ডায়মান মানবেতিহাসের ক্রমপ্রসৃতির সূত্র। সেটি হচ্ছে বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতা। আপাতদৃষ্টে এই গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র একই সূত্র থেকে উত্থিত এবং এদের যাপিত জীবনের প্রেক্ষাপটও অভিন্ন। কিন্তু সম্পদের খানিক সমৃদ্ধি তাদের দুজনের মধ্যে একটি স্তরগত ব্যবধান তৈরি করে দিয়েছে আর সেই ব্যবধান রূপ নিয়েছে অদৃশ্য দেয়ালে, যা তারা দুজনেই বিশ্বাস করে এবং মেনে চলে। আর মেনে চলে বলেই একে অপরের উপর চড়াও হতে দ্বিধাবোধ করে না এবং অপরে সেই চড়াও হওয়াকে ওই ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকার বলে মেনে নেয়। কিন্তু সকল স্বাভাবিকতাই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে তখন যখন তা অপরের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে আবির্ভূত হয়।

এ গল্পে আসিয়া খাতুন যখন আম্বিয়াকে তার স্বামীর আর্থিক দুরবস্থা নিয়ে বা অন্যান্য করুণ বিষয় নিয়ে কথা বলে তখন তা আম্বিয়া মেনে নেয় আসিয়ার স্বাভাবিক অধিকারবল হিসেবে। কিন্তু ছেলের গোরা রঙের উৎস নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আম্বিয়ার চরিত্র নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত করে তখন তা ছাড়িয়ে যায় সহ্যের সীমা, রুখে দাঁড়ায় আম্বিয়া, যেমন একদিন রুখে দাঁড়ায় অপমানে দেয়ালে পিঠ ছোঁয়া প্রলেতারিয়েত শ্রেণি। শহীদুল জহির সন্দেহাতীতভাবে আম্বিয়ার জাগরণের মধ্যে প্রলেতারিয়েতের দ্রোহকেই অঙ্কন করেছেন কিন্তু যে দ্বন্দ্বসূত্র ধরে এ-দুয়ের আগুনরঙা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন তার নাড়িমূল চিহ্নিত করতে গেলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ছেড়ে চলে আসতে হবে উত্তর-উপনিবেশবাদের[৬০] দুয়ারে।

যেখানে তিনি দেখাতে চেয়েছেন শোষক চলে গেলেও হাজার বছরের শোষণের প্রক্রিয়া আমাদের জাতিগত চৈতন্যে রেখে গেছে কিছু স্থায়ী ছাপ, কিছু বিশ্বাসের ভাবনার অক্ষয়-ছাঁচ তৈরি করে রেখে গেছে আমাদের সামূহিক নির্জ্ঞানের স্তরে স্তরে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো সৌন্দর্যবোধ; যেখানে স্থায়ীভাবে আমাদের মন সুন্দর বলতেই বোঝে ফর্সা ও সাদাকে। এই সাদা রঙের মোহ ছিলো বলেই আম্বিয়াকে পছন্দ করা সত্ত্বেও পুত্রবধূ করে ঘরে তোলেননি আসিয়া খাতুন, চেয়েছেন ফর্সা উত্তরাধিকার, এনেছেন ময়নার মতো গোরাসুন্দরীকে ঘরের বউ করে। ফলে সেখানেই স্বীয় স্বপ্নের

পরিপূরণে স্বপ্ন দেখিয়েও নিম্নস্তরের আম্বিয়াকে বঞ্চিত করেছেন তিনি এবং রোপিত হয়েছে গল্পের ভবিতব্যের দ্বন্দ্বের[৬১] বীজ। অতঃপর কামনার অচরিতার্থতা এবং বঞ্চিতের কাছে সেই প্রার্থিতের অবস্থিতি গল্পের শীর্ষবিন্দুতে আগ্রাসী করে তুলেছে আসিয়া খাতুনকে। আর সেই আগ্রাসনের বিপরীতে রুখে দাঁড়িয়েই নিজের স্বকীয় অস্তিত্বের ঘোষণা দিয়েছে আম্বিয়া। অর্থাৎ গুরুত্ববিচারে মহৎ লেখকদের মতোই ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দ্বন্দ্ব ও বর্ণান্ধ ঔপনিবেশিক সৌন্দর্যবোধ[৬২]– এই দুটি সূত্রকে মূলীভূত করেই শহীদুল জহির মাটি ও মানুষের রঙের আশ্চর্য আখ্যান তৈরি করেছেন এই গল্পে।

মাটি ও মানুষের রঙের পাশাপাশি শহীদুল জহির দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন সমাজের সেইসব উন্মূল মানুষের দিকে, নিয়তি যাদের বাধ্য করেছে মাটির সঙ্গে দূরত্ব রাখতে। যারা আর্থ-সামাজিক শত বাধায় বিপন্ন, আত্যন্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যারা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অক্ষম, অযোগ্য মানুষ হিসেবে যারা নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য ধৈর্য ধরে থাকে, অপেক্ষা করে পরবর্তী নতুন সকালের, স্বাপ্নিক হয়ে ওঠে আবার ঘুরে দাঁড়াবার– 'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে' গল্পটি সেই স্বপ্নদর্শী মানুষের আখ্যান।

আনন্দ পাল লেনের মানুষের জীবনে হঠাৎ নিরানন্দের উপদ্রব হয়ে আবির্ভূত হয় নবাব। যখন এ-মহল্লায় বাড়তে থাকে জনবসতি তখন ক্রমবর্ধমান বাস্তুসংকট বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য অনেকেই নিজের জমিতে নতুন ঘর তুলতে থকে, সেই ধারাবাহিকতায় পুরনো মন্দিরের গা ঘেঁষে নেপাল ঠাকুর গড়ে তোলে একটি খুপরি, নবাব সেই খুপরির ভাড়াটিয়া হিসেবে জায়গা করে নেয়, তারপর নিজেই নিজের অদ্ভুত জীবনযাপন দিয়ে কেড়ে নেয় সকলের দৃষ্টি, সকলের ভাবনাজগতে একটা নেতিবাচক মূর্তি নিয়েই সে আবির্ভূত হয় গল্পে। সমাজের বা মহল্লার মানুষের সেই ভাবনার সংবাদ দিয়ে লেখক গল্পটি শুরু করেছেন –"লোকটা দিনকে দিন যেন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"[৬৩] ব্যস্ত নাগরিক জীবনের কিম্ভূতভাবনার খোরাক হয়ে ওঠে সে, নতুন চিন্তার ঢেউ নিয়ে আসে মহল্লার মানুষের সামষ্টিক মানসলোকে – লেখকের বর্ণনায় "আনন্দ পাল লেনের অধিবাসীদের জীবন নিস্তরঙ্গ নয়। তবুও পাড়াটার বহিরঙ্গে একটা সুনসান ভাব ছিল। মনের ভেতর যা-ই থাক, বাইরে সকলেই এতটা একাত্ম ছিল অথবা এতটা বিচ্ছিন্ন ছিল পরস্পরের যে অন্যকে নিয়ে আলাপ করার মতো কিছু যেন তাদের ছিল না।... আনন্দ পাল লেনের এই মানস চেহারাটা পাল্টে দেয়ার জন্যই যেন লোকটা এসে গেড়ে বসল পাড়ায়।"[৬৪]

যূথবদ্ধ জীবনের সুপরিচিত ধারায় উড়ে এসে যদি কেউ নিজের অভিনবত্ব নিয়ে জায়গা করে নিতে চায়, এবং তার পদ্ধতি যদি পরিপার্শ্বের মানুষের কাছে ঠেকে সংশয়জাগানিয়া, তবে ভেতরে ভেতরে তার ওপর খেপে উঠবে সবাই – এটাই

স্বাভাবিক সামাজিক প্রতিক্রিয়া। এবং সেই প্রতিক্রিয়ামিশ্রিত দৃষ্টিকোণ থেকেই নবাব সর্বত্র বিবেচিত হয়েছে প্রতিনায়কের মতো। নেপাল ঠাকুরের কাছ থেকে মন্দিরের রোয়াকে গড়ে ওঠা ঘরটি ভাড়া নিয়ে পাড়ায় স্থিত হয়েই সে সবার মানোযোগের কেন্দ্রে আসীন হয়ে যায়, প্রথমে যদিও সবাই তার অবস্থান বিষয়ে না-ওয়াকিফ থাকে, তারপরও সে-ই যেন "আনন্দ পাল লেনের জীবনধারায় আস্তে আস্তে পাক দিতে শুরু করল নিজে মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে।"[৬৫]

প্রথমদিকে নবাবের অজ্ঞাত পেশা এবং রহস্যময় জীবনযাপন সবার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। একটা ছোট্ট কুঠুরিতে সন্তান নিয়ে মানবেতর বসবাস, দোকানে দোকানে চেয়ে চেয়ে বাকি খাওয়া এবং এক পর্যায়ে ভাড়া না দিতে দিতে ওই ঘরের দখলদার বনে যাওয়ায় জনমনে একটা বিক্ষিপ্ত মনোভাব তৈরি করে নবাব। তার শুদ্ধ চর্চিত বাংলা উচ্চারণ অন্যদিক থেকে তাকে আলাদা করে রাখে মহল্লার মানুষ থেকে[৬৬]। কেমন যেন নির্বোধ ও গা-ছাড়া ধরনের জীবন যাপন দিয়ে নিজেকে সে একটা স্বতন্ত্র ভাবনার বৃত্তে আবদ্ধ করে রাখে, কিন্তু মহল্লার "লোকে অবশ্য তাকে নির্বোধ ভাবতে রাজি না। ভাবে, শালা ঘুঘু।" সকল লোকের মাঝে বসে কেবল নিজের মুদ্রাদোষে নিজেকে আলাদা করে রাখলেও নানাবিধ প্রয়োজন মেটাতে তাকে বিভিন্ন জনের শরণাপন্ন হতে হয়, কিন্তু লোকে তো তাকে আড়ালে আড়ালে 'ঘুঘু' বলে চিহ্নিত করে রেখেছে। ফলে তাদের আচরণ প্রত্যাশানুযায়ী হয়, দ্বন্দ্ব জমে ওঠে, অবৈধ উপায়ে মেটাতে হয় নিজের প্রয়োজন।

এটি এমন একটি পরিস্থিতি যে, সবাইকে মেনে নিজের প্রয়োজন মেটাতে গেলে সে বাধার সম্মুখীন হয়, আবার নিজের মতো করে মেটালেও অন্যের সন্দেহ বা রোষদৃষ্টির শিকার হয়ে পড়ে। এই অহি-নকুল অবস্থাতেও নবাব বেঁচে থাকতে চায়, বাঁচিয়ে রাখার স্বপ্ন দেখে সন্তান রফিককে।

বেঁচে থাকার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ভবঘুরে পিতার সার্থক উত্তরাধিকার হয়ে একদা ঘর ছেড়ে আসা নবাবের মনে বয়ে চলেছে যুগপৎ রেখা, একটি রেখা তাকে থিতু হতে দেয় না, আরেকটি রেখা ঘরে বেঁধে রাখে আদ্যন্ত। শেষোক্ত রেখাটি সে লাভ করেছে জরিনার ভালোবাসা থেকে। কিছু না থাকা সত্ত্বেও যে তাকে সব কিছুর স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তারপর বন্ধন ছিঁড়ে পাড়ি জমিয়েছিল পরলোকে, তারই রেখে যাওয়া বুকের মানিক রফিক, নবাব তাই রফিককে সুন্দর ভবিষ্যৎ দিয়ে যেতে চায়, রাখতে চায় জরিনার ভালোবাসার মান।

এর জন্য প্রথমে প্রয়োজন থিতু হয়ে বসবাস। কিন্তু থিতু হবার জন্য যেসকল যোগ্যতা আবশ্যক, সেই মানের মন ও অর্থসামর্থ্য নেই নবাবের। তাই তাকে অস্থির-স্থিরতায় চলতে হয় যাযাবরের মতো। কোনো জায়গায় যতদিন মাটি কামড়ে টিকিয়ে রাখা যায় নিজেদের, সেখানে সেই কদিন-ই। কিন্তু আনন্দ পাল লেনে সে তার সেই

স্থৈর্য অর্জনের মুখে সম্মুখীন হয় নানা বাধার। মহল্লার লোক এক সময় তাকে নিজেদের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে। "অনেকটা হালকা দাদের সমস্যার মতো। বিরক্তিকর, কখনো কখনো উত্তেজক।" কার্যত এই চুলকানি সমস্যা নিয়ে সাধারণ লোক চুলকাতে মজা পায় এবং একসময় দেখা যায় "আনন্দ পাল লেনের ঠাকুর বাড়ির আশেপাশের অধিবাসীদের এখন দিন কাটে নবাব প্রসঙ্গ নিয়ে।" তাদের সাদা-কালো ভাবনার কচলানি ধীরে ধীরে তৈরি করে ময়লা আর সেই ময়লার মতো ভাবনা তাদের মনে বর্জ্যের আবরণ দিয়ে দেয়, তাদের ভাবনার "ক্রমাগত আবর্তনে ভেসে ওঠে ননি। কালো ননি।" এবং তারা এ পর্যায়ে স্থিরসিদ্ধান্ত যে "লোকটা ঘুঘুই।" এই সিদ্ধান্ত থেকেই তাদের মধ্যে নবাবকে নিয়ে আলোচনা চলে, তাদের "আলোচনার চক্র ঘুরতে থাকে আর কালো থেকে কালো হয়ে জমতে থাকে সর।"

আনন্দ পাল লেনের মানুষ উৎসাহী হয়ে ওঠে তার সম্পর্কে জানতে, তাদের ধোঁয়াশা কাটে যখন তারা জানতে পারে যে, নবাব একটি ব্যাংকে সুইপার (মেথর) হিসেবে কাজ করে। কার্যত নবাব তার অবস্থান হারায় এবং সামাজিক দৃষ্টির বিবেচনার রেখা তার বেলায় আরও নিম্নতর হয়[৬৭]। কিন্তু শহীদুল জহির ব্যক্তির জীবনকে আরও দীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখাতে সচেষ্ট, ফলে নবাবের "মলিন পোশাক, চেহারা আর বিনয়ী হাসির জেদ ঠিকই রয়ে গেল। নেপাল ঠাকুরের বুকের ওপর ভারি পাথরের মতো চেপে বসে নবাব দিন মাস কাটিয়ে দিতে লাগল। সূর্য অস্ত আর উদয়ের বিন্দুতে চক্কর খেল আনন্দ পাল লেনের রাস্তার উপর একঘেয়ে হলুদ আলো ফেলে ফেলে। নবাবকে নিয়ে আলোচনাও একঘেয়ে হয়ে গেল।"[৬৮]

এমতাবস্থায় গল্পকার গল্পে প্রাণ ফিরিয়েছেন পৌরসভার নির্বাচন নিয়ে এসে। সৈয়দ হোসেন ও এরশাদ মিয়ার নির্বাচনী লড়াইয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে আবারও আলোচনায় আসে নবাব। এরশাদ মিয়াকে নিজের আচরণ দিয়ে কাবু করে বটে কিন্তু তার এই সাফল্য সকলের মনে আবারও অস্বস্তি জাগিয়ে তোলে, "নবাবকে নিয়ে সকলের অস্বস্তি ভেতরে পিঁপড়ের মতো সুড়সুড় করে হাঁটে।" তাই মহল্লার মানুষ নিজেদের হিংসাপরায়ণতার সঙ্গে ভাবতে থাকে –"লোকটাকে একদিন ধরা দরকার। ফকিরের বাচ্চা একটা, মানসম্মান কিছু নেই। বাকি খেয়ে, চালিয়াতি করে জীবন কাটাচ্ছে। তার ডাঁট কি! কিসের ডাঁট, কোথায় ডাঁট কেউ জানে না, তবুও মনে হয় ডাঁট আছে।"[৬৯] কন্টকপ্রতিম ভাবে বলেই নবাবের অজ্ঞাতে তার পরিণতি তৈরি করতে থাকে সমাজের মানুষ। থাকে তারা সুযোগের অপেক্ষায়, সুযোগ আসে এক পর্যায়ে চূড়ান্তরূপে।

কোনো এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় যখন সবাই নিজেদের ঘরে আড়ষ্ট, যখন বাইরের পৃথিবীর মানুষ নিয়ে কেউ ভাবছে না, এমন কি দোকানদার ফজলু বের হতে পারছে না দোকানের ভেতর থেকে, তখন কোনো এক ভিখারি রমণী সন্তান কোলে আশ্রয়

নেয় মন্দিরের বারান্দায়, পরম মমতার বশে নবাব বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য নিজের ঘরে জায়গা দেয়, দোকানের ভেতর থেকে দেখে ফজলু, এ দৃশ্য দেখে "ফজলুর মাথার মধ্যে দিয়ে একটা পোকা হেঁটে যায়।"[৭০] দলবল নিয়ে ডেকে আনে এরশাদ মিয়াকে। সবাই তাকে সাব্যস্ত করে দোষী হিসেবে। মেয়েটিকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে বিবাহ দিতে চায় নবাবের সঙ্গে। যেন ফাঁদে ফেলে দিয়েছে কাঙ্ক্ষিত 'ঘুঘু'কে, এমনই উল্লাস জেগে ওঠে মহল্লার ঈর্ষাকাতর লোকগুলোর মধ্যে। পাপের প্রমাণ হিসেবে তারা যেন নবাবের গলায় ঝুলিয়ে দিতে চায় ভিখারিণীর মালা। যেন এই কোনোমতে পেট চালানো লোকটির কাঁধে আরও দুটি পেট চালানোর বোঝা চাপিয়ে বদলা নিতে চায় অনির্দেশ্য অপমানের, তারা তাই মেয়েটির ধর্ম-নাম কিছুই জানতে চায় না, আর যখন জানতে চায় তখন কোনো সুযোগই থাকে না বলার। এমন পরিস্থিতিতে গলা উঁচানোর সুযোগ থাকে না, সময় থাকে না নিজের কিছু বুঝিয়ে বলার, প্রতিবেশের সবাই যখন প্রতিকূল তখন সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না কোনো, সম্মিলিত গোষ্ঠীর সামনে তাই আপাত পরাজয় মেনে নেয় নবাব – "নবাব খুব হালকা করে ঘাড় নাড়ে। অস্ফুট স্বরে যেন বলে, না। ভয় করে, গলা বুজে আসে।"[৭১] শহীদুল জহির চরিত্রের মৌলপ্রবণতা ধরে রাখেন এই পরিস্থিতিতেও, তাই বর্ণনা করেন–"তবু উঠে দাঁড়ায় ও, আবার বলে, না।" মন থেকে মরে যাবার পাত্র নবাব নয়, তাই "আধো-ভৌতিক অন্ধকারে ঢোক গিলে গিলে গলা ভেজাতে ভেজাতে সে অপেক্ষা করে, তারপরের।"[৭২]

নবাব চরিত্রটির আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে শহীদুল জহির যৌক্তিক করে তুলতে সেগুলোর সূত্রনির্দেশ করেছেন অসামান্য দক্ষতায়। নবাবের চরিত্র-প্রকৃতির স্বরূপ নির্মাণে তিনি নবাবের অতীতে প্রযুক্ত করেছেন দুটি চরিত্রকে, যাদের একজন হচ্ছে নবাবের পিতা আনছারউদ্দিন, অন্যজন তার স্ত্রী জরিনা। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আনছারউদ্দিন চলে এসেছিল কুষ্টিয়ায়, বেছে নিয়েছিল সহজতর জীবিকা-অর্জনের বৃত্তি 'চাটুকারিতা', যে কারণে সে পরিচিতি পেয়েছিল 'লেঙ্গুর' নামে। পিতার সেই করুণ অবস্থা ভাবলে আজও নবাবের "কানের গোড়া লাল হয়ে যায়"[৭৩]। তবুও পিতার সেই আশ্চর্য টিকে থাকার কৌশল তাকে অভিভূত করে প্রায়শ। পিতার "জমি-জিরেত ছিল না বললেই চলে, ছিল মুর্শিদাবাদসূত্রীয় একটা অতিপ্রাকৃতিক অলৌকিক গর্ববোধ, ধূর্ত চাহনি আর রেশমের মতো মোলায়েম একটা স্বভাব।" পিতার স্বভাবগত উত্তরাধিকার পুরোপুরিই পেয়েছিল নবাব। তাই সে হতে পারেনি কোনো কাজেই "তুখোড়"। "গরিবের রাগ থাকতি নেই"– পিতার এই উপদেশ যেন বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল তার। সামাজিক অযোগ্যতা তার স্বভাবে তাই এনে দিয়েছিল বৈরাগ্য, পালিয়ে বেড়াবার প্রবল আগ্রহ। তাই সে থিতু হতে পারেনি কোথাও। কিন্তু হৃদয় তার বশ মেনেছিল জরিনার কাছে। তাই "বন্ধনহীনতার চাইতে জরিনার বন্ধন অনুপম মনে হয়েছিল।" খানিকটা স্বপ্নের বীজ রোপণ করে দিয়েছিল

তার মনে সেই পরলোকগতা জরিনা। ফলে স্বাপ্নিকতার সঙ্গে স্বাভাবিক ঔদাসীন্য যুগপৎ সঙ্গী হয়েছিল তার। তাই সকলের অবহেলা গায়ে সয়ে গেছে তার। সন্তানকে ধীরে ধীরে যোগ্য মানুষ করে তুলবে এই স্বপ্নের বাস্তবায়নকল্পে সয়ে গেছে সকল অপমান, অবহেলা।

একটা সুপ্ত আশাবাদের তাড়নায় নবাবকে শেকড় ছড়াতে চেয়েছে আনন্দ পাল লেনের জীবনে। কোনোমতো টিকে থাকার জন্য জুটিয়ে নিয়েছে আশ্রয়, স্বভাববিরুদ্ধ পেশা[৭৪]। শতক্ষত পড়লেও জীবনকে জীবনের গতিতেই চলতে দেয়– "পঞ্জিকার পাতায় ঋতু গড়ায়। পঞ্জিকার ঋতু বদল জীবনে উঠে আসবে – এই আশা নিয়ে নবাব ক্ষতের মুখের মাছি তাড়ায়। ক্ষত গলে, পঁচে। নবাব মাছি তাড়ায় চুপচাপ আশা নিয়ে। রফিক স্কুলে যায়। নবাব ব্যাঙ্কের টয়লেট ধোয়। টিকে থাকে। টিকে থাকলে জীবনে ঋতু-বদল ঘটবে হয়তো, নবাব ভাবে, বন্ধ্যা জীবন ঋতুমতী হবে, জমি আর নারীর মতো জীবনের ভাঁড়ারে সোনার ফসল হবে।"[৭৫] এই স্বপ্ন দেখতে তাকে যে জরিনাই শিখিয়েছিল তা নিঃসন্দেহ। তাই সে স্বপ্ন বাঁচাতে চায়, রফিককে ভাবে জরিনার স্বপ্নের আধার। তাই পুত্রমাত্র পুঁজি নিয়ে টিকে থাকতে চায় সে মাটি কামড়ে।

কিন্তু তার মনের কোথাও হয়ত সংশয়-রেখা ক্রিয়মান ছিল, তাই একবারে শেষ মুহূর্তে নিজের পরিস্থিতি অবলোকন করে নবাবের মনে হয়– "এভাবে হয় না। মনের কোথাও যেন জানা ছিল, হবে না। অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিশ্বাস স্থাপন করে বসেছিল সে, যদি হয়ে যায়, নৌকো যদি পার হয়ে যায় কোনো রকমে সমাজ-সংসারের খরস্রোতে ডুবিডুবি করেও।" গল্পের পরিণতিতে লেখক দেখিয়ে দেন যে, "তা হয় না, নৌকো ডুবেই যায়।" এমতাবস্থায় যার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে সে এই ভাসমান জীবনে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে সেই "জরিনাকে মনে পড়ে নবাবের।" এবং নিজের ভাবনার বাইরের, কল্পনার অতীত কোনো ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করে, "অপেক্ষা করে, তারপরের।" ভবিতব্য হোক তার আরও ক্ষতযুক্ত, মাছি সে না হয় তাড়াবে না, তবুও এই অন্ধকার কেটে আসুক আলো, আসুক রোদ, জীবনের আর্দ্রতা কেটে শুষ্কতা আসুক। সে রোদে ক্ষত বা ঘা থাকুক, রোদটা হোক ঘেয়ো, তবুও তা আসুক। এই ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে বেঁচে থাকে নবাব এবং তারা – যারা স্বভাবে প্রকৃতিতে অভিন্ন, সেইসব নবাবেরা। শহীদুল জহির সমাজের এই উন্মুল-নিম্নরেখ মানুষগুলোর জীবনের নানাবিধ প্রার্থনা নিয়ে সাজান আখ্যানের পসরা, সর্বোপরি জীবন টিকিয়ে রাখার প্রত্যাশা নিয়ে লেখেন তাঁর জীবন ও মাটিগন্ধী গল্পগুলো।

শিল্পভঙ্গি বিবেচনায় বলা যেতে পারে 'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে' গল্পটি শহীদুল জহিরের বাঁকবদলের গল্প। উন্মুল মানুষের আখ্যান লিখলেও শহীদুল জহির এই

গল্পের প্রতিবেশ রচনা করেছেন পুরাণ ঢাকার একটি মহল্লাকে মূল করে[৭৬]। সংঘবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত পাড়া বা মহল্লার মানুষের সামষ্টিক মানস নিয়ে উত্তরকালে শহীদুল জহির যে-কথাসাহিত্যের চর্চা করেছেন, এই গল্পটি যেন সেই শিল্পকৌশলের প্রস্তুতি। সঙ্গনিবিড় শহুরে মহল্লার মানুষ তাদের পরিচিত জীবনে হঠাৎ করে কেউ এসে যদি বুক চিতিয়ে, তাদের পরোয়া না করে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে চলে, তাহলে তার প্রতি সেই মহল্লার স্থায়ী বা দীর্ঘদিনের পাড়াবাসীর যে সংক্ষুব্ধ ভাবের সৃষ্টি হয়, এবং সেই সংক্ষোভ যে কোনো এক সময় তীব্রতরভাবে প্রকাশ পেয়ে ওই আগন্তুকের জীবনকে ব্যাহত করে সেই সামষ্টিক বাস্তবতার চিত্র শহীদুল জহির এই গল্পে তুলে এনেছেন।

বাস্তববাদী শিল্পীর মতোই শহীদুল জহিরের লক্ষ্য বস্তুনিষ্ঠার দিকে। বাক্যবয়নে লেখক তাঁর 'পারাপার'-পর্বে ওয়ালীউল্লাহ্ ও ইলিয়াসের ধারাকে প্রবর্ধন করলেও পরবর্তীকালে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন স্বকীয় ভঙ্গি। প্রথম পর্যায়ে জহির নিষ্ঠার ছাপ রেখেছেন চরিত্রের ভাষা ভাবনায়, চরিত্রের মুখে দিয়েছেন শ্রেণিলালিত ভাষারূপ। মাটিলগ্ন, শ্রমসম্পৃক্ত চরিত্রগুলো কথা বলে উঠেছে নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ত শব্দবয়নে। কখনও নিজের আঞ্চলিকতায়, কখনও শহরের ক্লিশে উচ্চারণে আবার কখনও চর্চিত বাংলায়। বস্তুত, লেখক সতত সচেতনতায় চরিত্রগুলোর বাক্‌ভঙ্গি নির্মাণ করেছেন প্রতিবেশলগ্ন যৌক্তিকতায়। পুরান ঢাকার বাকনির্মাণে 'ভালোবাসা' গল্পের শহীদুল জহির এই গল্পে আরও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছেন। এই ফল্গুময় স্ফূর্ততা যেন দিনের প্রথম সূর্যসদৃশ; যার আলোকতীব্রতা দিনের অনাগত প্রাখর্যের ইঙ্গিত দেয়। এ যেন সেই শহীদুল জহিরের প্রাণজ প্রস্তুতি, ভবিষ্যৎ যাকে স্তুতি করবে পুরান ঢাকার কথক[৭২] হিসেবে। যিনি বারংবার পুরান ঢাকা চরিত্রসমূহ নিয়ে গল্প ফাঁদবেন, এবং সেই চরিত্রগুলো শব্দের প্রাণোচ্ছলতায়, বাক্যের পুনরাবৃত্তিতে একজন পরিপূর্ণ শিল্পীকেই উপস্থাপন করবে। যদিও তিনি কোনো একসময় অস্বীকার করতে চাইবেন এই হাফিজদ্দি-আবেদা-তোরাব সেখ-জমির-লালবানুদের আখ্যান; অস্বীকার করতে চাইবেন এই আঁতুড়কালীন শিল্পবুননকে।

তথ্যপঞ্জি ও টীকা

১. বাংলাদেশের কথাসাহিত্য বলতে এখানে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে প্রচলমতানুযায়ী ১৯৪৭ সালের ভারত-বিভাগোত্তর কালকে বোঝানো হয়েছে এবং সে হিসেব অনুযায়ী বর্তমান প্রবন্ধে 'অনধিক ছয় দশক' শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে।

২. বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ইতিহাসে প্রোজ্জ্বল কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে জন্মসন অনুযায়ী শহীদুল জহির কনিষ্ঠজনদের-ই অন্তর্ভুক্ত; কেননা, তিনি আশির দশকে (গ্রন্থাকারে লেখক হিসেবে প্রকাশ অনুযায়ী) আত্মপ্রকাশ করেছেন (*পারাপার;* ১৯৮৫) এবং পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকের অনেক স্বনামখ্যাত সাহিত্যিকও অদ্যাবধি জীবিত। সেই বিবেচনায় তিনি পরলোকপ্রাপ্ত অনুজপ্রতিম।

৩. দেশীয় আর্থ-সামাজিক মানদণ্ডে সম্মানের বিচারে যে সকল পেশাকে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদান করা হয় তন্মধ্যে সরকারি প্রথম শ্রেণির পদ অগ্রগণ্য। শহীদুল জহির ছিলেন সেই সরকারি প্রথম শ্রেণির পেশাজীবী। এই বাস্তবতার নিরিখেই বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর দৃশ্যমান সামাজিক অবস্থানকে নির্দেশ করা হয়েছে।

৪. বাস্তববাদী সাহিত্যের ধরাবাহিকতা রক্ষা করেই বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের পথচলা শুরু; তৎসঙ্গে মার্কসীয় শিল্পভাবনা এবং পরাবাস্তবের চর্চাও এদেশের কথাসাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়েছে ষাট-সত্তরের সাহিত্যিকদের দ্বারা। কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে জাদুবাস্তবতার শিল্পকৌশল ব্যবহারে শহীদুল জহির ধারাবিচ্যুত – একক এক নির্মাতার নাম।

৫. পিতার অল্প-বিস্তর লেখালেখির গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন – এমন বিশ্বাসে স্থির ছিলেন শহীদুল জহির। এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন সেই তথ্য: "আমার মনে হয় যে, আমি লিখি কারণ এটা আমার রক্তের ভিতর ছিল। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়তো তার চাইতেও কিছুটা বেশি, কারণ আমি জানি আমার বাপও লেখার চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নাই।... আমি আমার বাপের ধ্বজা ধারণ করার জন্য লিখতে শুরু করি নাই, তার স্বপ্ন পূরণের কোন দায় আমি কখনো গ্রহণ করি নাই। তবু আমার রক্তের ভিতরের তাড়নায় আমার বাপ উপস্থিত ছিল, নাকি ছিল না, কী করে বলি।" (কথাশিল্পী কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার/ কথা ২০০৫ সংখ্যা) সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সম্পাদিত 'শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ' ২০১০, পৃষ্ঠা–৫৬৬, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

৬. ১৯৪৭–২০১৩ এই অন্তর্বর্তীকালে প্রচুর লেখক আত্মপ্রকাশ করলেও বহমানকালের গায়ে উৎকর্ষ-বিচারে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন এবং তা বহন করে চলেছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন। তন্মধ্যে শিল্পস্বকীয়তালক্ষণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ লাভ করেছেন উৎকর্ষের অভিধা। শহীদুল জহিরকে প্রচলবিচারে তাঁদেরই শিল্পপ্রলম্বকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৭. পারাপার, প্রথমপ্রকাশ : জুন ১৯৮৫, মুক্তধারা, ঢাকা

৮. একজন শিল্পী যখন পেয়ে যান তাঁর ঈপ্সিত পরিপূর্ণতা, যখন নিজের কণ্ঠকে হাজারো কণ্ঠের মধ্যে চিনতে পারেন আলাদা করে, তখন-ই তিনি নিজস্বতা চিহ্নিত করতে তৎপর হয়ে ওঠেন; তখন আরও নির্দিষ্ট করার প্রয়োজনে নিজের কোনো সৃষ্টিকেও তিনি অস্বীকার করেন। কেননা তা তাঁর অধুনালব্ধ স্বকীয়তাকে ক্ষুণ্ন করে। হয়তো এই ভাবনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মানসী'-পূর্ব রচনাগুলোকে করেছিলেন 'অচলিত সংগ্রহ'ভুক্ত, জীবনানন্দ দাশ 'ঝরা পালক' কাব্যগ্রন্থটিকে করতে চেয়েছেন অস্বীকার। শহীদুল জহির হয়তো তেমন ভাবনা থেকেই 'পারাপার' গ্রন্থটিকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। এই ঘটনার সাক্ষী লেখক আহমাদ মাযহার, তিনি জানিয়েছেন: "আমাকে সেদিন তিনি *পারাপার* বইটিকে তাঁর সৃষ্টিকর্ম হিসেবে গণ্য না করতে অনুরোধ করেছিলেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন যে, ওতে লেখকের স্বাতন্ত্র্য তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ করা যাবে না।" সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সম্পাদিত 'শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ' ২০১০, পৃষ্ঠা–৪২২, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

৯. শহীদুল জহিরের প্রথম উপন্যাস; *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*, প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৩৯৪, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা।

১০. পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত আধুনিক শিল্পোপকরণ বাংলাদেশি লেখকদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-ই প্রথম সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক সাহিত্যধারার সঙ্গে বাংলাদেশের সাহিত্যকে করেন সমাত্ম। তাঁর শৈল্পিক প্রচেষ্টা ধরেই প্রতীচ্যের সমসাময়িক ব্যক্তিনৈঃসঙ্গ্য, মর্বিডিটি, নাস্তিবাদ, অস্তিত্ববাদী দর্শন, চৈতন্যপ্রবাহরীতি, এবসার্ডিটি ইত্যাদি বিষয়-প্রকরণ সমীভূত হয় বাংলাদেশের সাহিত্যের ধারায়।

১১. মগ্নচৈতন্য বা অবচেতনস্তরের বর্ণন; ভিন্নভাষায় চৈতন্যপ্রবাহরীতি (Stream of Consciousness)।

১২. আখ্যানবয়নের পদ্ধতিবিচারের আধুনিকতম মাধ্যম ন্যারেটোলজি। যেখানে ভাষার গঠন নির্দেশ করে দেয় তার উৎপত্তিস্থলের বৈশিষ্ট্য, ভাষার শরীর প্রকাশ করে বক্তার উভয়তলের (উপরিতল-নিম্নতল) বাস্তবতা। কখনও কখনও বক্তার পরিপার্শ্ব, তার বাস্তু ও মনোজাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করে তার ভাষিক অভিব্যক্তি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলোর গতি-প্রকৃতি, চিন্তা ও প্রকাশিত ভাষার বিন্যাস লক্ষ করলেই বর্ণনার ভাষার বহুস্তরিক রূপ দৃষ্ট হয়। যদিও অলংকারশাস্ত্রানুযায়ী রূপক, প্রতীক প্রভৃতি অলংকার স্তরবহুল অর্থময়তা ধারণ করে; কিন্তু উত্তরাধুনিক শিল্প-বিবেচনায় স্তরময় ভাষাকাঠামো একটি অভিনব তাত্ত্বিক বিষয়।

১৩. "ষাটের দশক থেকে বাংলাদেশে কথাসাহিত্যের জন্য যে গদ্যরীতি গড়ে উঠেছে সেই আবহই রয়েছে এর ভাষায়।"– *পারাপার*-এর শহীদুল জহির: আহমাদ মাযহার, সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সম্পাদিত 'শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ' ২০১০, পৃষ্ঠা–৪২৩, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

১৪. "বাংলাদেশের সাহিত্যে একেবারেই আলাদা একটা জায়গা থেকে সমাজ-বীক্ষণ, ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে সমাজ আর সমাজের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি– শুরু করেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। শহীদুল জহির হয়ে ওঠেন তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি। তবে উত্তরসূরি তার বেশি কিছু নয়, ছায়া প্রতিচ্ছায়া নয়, ধ্বনির প্রতিধ্বনি নয়, এক নতুন ওয়ালীউল্লাহ্ নয় বরং ওয়ালীউল্লাহ্র ভিতর দিয়ে এক শহীদুল জহির, মৌলিক, ছাপিয়ে যাওয়া, চূড়ান্ত স্বতন্ত্র এবং শহীদুল।"– হাসান আজিজুল হক: *সোনা-মোড়া কথাশিল্পী: শহীদুল জহির*; সূত্র: ওবায়েদ আকাশ সম্পাদিত *শালুক*, সেপ্টেম্বর ২০০৮।

১৫. ছাত্রজীবনে শহীদুল জহির রচনা করেছেন আরও একাধিক গল্প; রচনাকাল বিচারে সেগুলিই প্রথমে অবস্থান করবে; কিন্তু ১৯৮৫ সনে মুক্তধারা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত *পারাপার*-এর প্রথম সংস্করণে রচনাকাল অনুযায়ী গল্পগুলি বিন্যস্ত হয়নি; বিষয়গুরুত্ব এবং লেখকের পছন্দ অনুযায়ী গল্পগুলির ক্রম সূচিত হয়েছে এভাবে: মাটি এবং মানুষের রং, তোরাব শেখ, পারাপার, ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে, ভালবাসা। যদিও পরবর্তীকালে পাঠক সমাবেশ প্রকাশিত *'শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প'* গ্রন্থে রচনাকাল অনুযায়ী গল্পগুলি বিন্যস্ত হয়েছে এবং সেখানে অনেক শব্দের বানানেও এসেছে দৃশ্যমান পরিবর্তন; যেমন– প্রথম সংস্করণের *পারাপার*-এ ভালোবাসা গল্পটির নামে 'ল' ও-কারান্ত ছিল না, ফলে নামটি ছিল এরকম– 'ভালবাসা'।

১৬. "সে অর্থে আমার লেখালেখিতেই শহুরে নাগরিক তেমন নাই। শহুরে ঢাকাইয়া আছে। পারাপার বইটাই গরিব লোকদের নিয়া লেখা, শহরের গরিব, গ্রামের গরিব।" সূত্র : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সম্পাদিত 'শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ' ২০১০, পৃষ্ঠা–৫৬৭, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

১৭. 'ভালোবাসা', *পারাপার*, শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প, প্রথমপ্রকাশ: পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঢাকা। পৃষ্ঠা : ১২

১৮. "এই গল্পগুলো মার্কসীয় দর্শনের সরাসরি প্রভাবের আওতায় লেখা। *পারাপারের* গল্পগুলোতে আমার তখনকার রাজনৈতিক চিন্তার প্রভাব আছে।" সূত্র : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সম্পাদিত 'শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ' ২০১০, পৃষ্ঠা–৫৬৬, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

১৯. বিবিধ প্রকার শিক্ষণ মানুষের রুচি ও কল্পজগৎকাঠামোর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দেয়। নিম্নবিত্ত বা সমাজের অন্তেবাসী জনগণ শিক্ষার মার্জনা লাভে ব্যর্থ বিধায় ধর্মীয় অলৌকিকতা কিংবা ফ্যান্টাসিজাত অসম্ভবকে অবলম্বন করে নিজের কল্পকাঠামো তৈরি করে নেয়। ভালোবাসা গল্পের আবেদা বা হাফিজদ্দির কল্পজগতও ওই ধরনের কাঠামোতে বিন্যস্ত বলে ধারণা করা যেতে পারে। কেননা, লেখক আবেদার মনোলোকে ওই শিক্ষণের উপাদান বপন করেছেন বলেই গল্পে আবেদা একবার হাফিজদ্দির আচরণ দেখে ভেবেছে : "খেপলো নাকি লোকটা। নইলে দিনদুপুরে ফুল হাতে করে বাড়ি ফিরল যে মরদ! আর ওকেইবা ডাকল কেন? ঘরে ঢুকতেই সিনেমার নায়কদের মতো খোপায় পরিয়ে দেবে না তো আবার?" সূত্র : 'ভালোবাসা', *পারাপার*, শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প, প্রথমপ্রকাশ: পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঢাকা। পৃষ্ঠা : ৯

২০. এতৎপ্রসঙ্গে সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা হতে পারে বাঙালির বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা মোতাহের হেসেন চৌধুরীর বিখ্যাত বক্তব্য: "ধর্ম্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জ্জিত লোকের ধর্ম্ম।" সূত্র: 'সংস্কৃতি-কথা', *সংস্কৃতি-কথা*, পৃষ্ঠা ১, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৪, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা। সন্দেহ নেই যে, শহীদুল জহির এই গল্পে সাধারণ মানুষের জীবন ও তাদের ভাবনার রূপায়ণ করেছেন এবং শহীদ দিবস পালন বিষয়টি বাঙালির সংস্কৃতির একটি মহিমাময় উদ্‌যাপন; এবং সেটি উদ্‌যাপন যারা করেন তারা শিক্ষিত ও মার্জিত।

২১. হাজার বছরের ভারতীয় ঐতিহ্যের বিশ্বাস মূলীভূত হয়ে গড়ে তুলেছে এদেশীয় নারীর বিশ্বাস ও মূল্যবোধের কায়া; সেখানে নারীর পতিভক্তরূপ-ই নির্দিষ্ট হয়েছে আদর্শ হিসেবে। আর সেই আদর্শের প্রত্নরূপ হচ্ছে সতী। যে সতত সৎ পতির প্রতি, যে সর্বত্র সেবাবতী সীতা-সাবিত্রীর মতো। এই সীতা-সাবিত্রীগণ-ই এদেশীয় নারীর চেতনায় প্রোথিত আদর্শের প্রত্নরূপ (Archetype)।

২২. এই স্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়েছে তার কল্পনার গড়ন ও লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়নে সিনেমাটিক সম্ভাব্যতায় স্থিতবিশ্বাস থেকে। কেননা, মার্জিত লোকের গৃহাভ্যন্তরে তার কর্মক্ষেত্র, সেখানেই সে প্রত্যক্ষ করেছে উঁচুশ্রেণির মার্জিত মানুষের আচার, তাদের

জীবনে চর্চিত বিস্ময়োদ্দীপক (Surprising) আয়োজনসমূহ; যে সকল আয়োজন অনেকাংশে সিনেমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

২৩. 'ভালোবাসা', *পারাপার*, শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প, প্রথমপ্রকাশ: পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঢাকা। পৃষ্ঠা : ৯

২৪. অসুন্দর চুলে সুন্দর ফুল বেমানান– আবেদার এই বোধও যে মার্জিতজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত, এমন মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক নয়। দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীর্ণতায় বসবাস হলেও তার মনোগহীনে সৌন্দর্য-বিষয়ক ভাবনাটি একান্তভাবেই সেই জীর্ণতা ও অসুন্দর থেকে মুক্ত।

২৫. নারীর স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ, নিজের সৌন্দর্যহীনতা এবং বয়সের সঙ্গে আচরণের অসঙ্গতি-বিষয়ক বোধ তাকে সচেতন করে তোলে। এতে আবেদার মনোলোকের ভারসাম্যতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

২৬. বস্তিজীবনে অভ্যস্ত হলেও আবেদা ঠিকা ঝিয়ের কাজ করে কোনো এক সাহেবের বাসায়– এই সূত্রেই নগরজীবনের অভ্যন্তরের অভিজ্ঞতা তার অজ্ঞাত থাকে না।

২৭. "ভালোবাসা' গল্পটা বাবুপুরা বস্তি এলাকার গল্প।" –শহীদুল জহির; সূত্র : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সম্পাদিত 'শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ' ২০১০, পৃষ্ঠা–৫৬৭, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

২৮. 'ভালোবাসা', *পারাপার*, শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প, প্রথমপ্রকাশ: পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঢাকা। পৃষ্ঠা : ৯

২৯. "গাড়ির ক্রুদ্ধ প্রশ্বাসে ধুলো লাফিয়ে উঠে ছুট লাগায় চতুর্দিকে। তোরাব গামছা দিয়ে নাক-মুখ চেপে ধরে বসে থাকে কিছুক্ষণ। এক গরম, তার ওপর ধুলোর জ্বালাতন সহ্য হয় না ওর। মেজাজ গরম করে উঠে পড়ে ও। বলে, শালার–" 'তোরাব সেখ', *পারাপার*, শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প, প্রথমপ্রকাশ: পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঢাকা। পৃষ্ঠা : ১৪

৩০. 'তোরাব সেখ', পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা : ১৫

৩১. এই প্রফুল্লতা যেন তোরাবের নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা, যেন চরম একাকিত্বে অস্তিত্বের শূন্যতাবোধকে ভুলে থাকার কৌশল।

৩২. 'তোরাব সেখ', পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা : ১৬

৩৩. এই দৃশ্যটিতে তোরাবের প্রতিক্রিয়াটি লক্ষ করার মতো, "প্রবল অহমিকার সটান ধনুকের ছিলায় যেন বহমান বাতাসের আঘাত একটি কম্পন সৃষ্টি করে গেল, ধনুকের মতো কেঁপে উঠলো তোরাব"।

৩৪. 'তোরাব সেখ', পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা : ১৭

৩৫. তোরাবের এই সংলাপে শহীদুল জহির যুগপৎ প্রকাশ করেছেন – সমাজের সুমার্জিত সভ্যভব্যদের মধ্যেও বহমান লিপ্সার সত্যতা এবং তোরাবের মতো অন্তেবাসী ব্যক্তিত্ববান মানুষের দৃষ্টিতে ওই শ্রেণির উচ্চমানদের বিশ্লেষায়িত ফলাফল।

৩৬. 'তোরাব সেখ', পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা : ১৭

৩৭. পূর্বোক্ত।

৩৮. কায়িক শ্রমের বাজারে শ্রমিকের বয়স ও কর্মক্ষমতা শ্রমের উপযোগ হিসেবে বিবেচিত হয়। তোরাবের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণপ্রবণ লেখক শহীদুল জহির সেই শ্রমবাজার ও তার মূল্য-নির্ধারণ প্রকৃতিই যেন ইঙ্গিতধর্মী ভাষায় তুলে ধরেছেন এখানে; শ্রমের বাজারে বয়োবৃদ্ধ তোরাব তাই 'পুরুষ' নয়, নিজেকে চিহ্নিত করেছে 'বুড়ো' হিসেবে।

৩৯. তোরাব তার সংসারে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। ফলে সে হয়ে উঠতে আগ্রহী উৎপাদন ও উপার্জনক্ষম। সে এও জানে যে, উপার্জনহীন ব্যক্তি সংসারে কীরূপ গ্লানির পাথর হিসেবে গণ্য হয়; একইভাবে তার কাছে গ্লানির পাথর হিসেবে গণ্য হয় উপার্জনের সুযোগহীন যে কোনো দিন। ফলত অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, কেন কর্মহীন আগামীদিনটি তার কাছে গ্লানিকর ঠেকে।

৪০. অভাবের বন্ধনী পরিবারের অন্য সদস্যদের লোভী করে তুললেও তোরাবের এই উচ্চকণ্ঠ বিরোধিতা তার নিরেট পিতৃসত্তা থেকে নির্গত। বস্তুগত অভাবের হুমকি তোরাবকে ব্যতিব্যস্ত রাখলেও কন্যার সদ্গতির ব্যাপারে পিতা তোরাব এখানে স্থিরপ্রতিজ্ঞ; মূল্যবোধশাসিত।

৪১. 'তোরাব সেখ', *পারাপার*, শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প, প্রথমপ্রকাশ: পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঢাকা। পৃষ্ঠা : ১৯-২০

৪২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ২০

৪৩. পূর্বোক্ত।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ২১

৪৫. পূর্বোক্ত

৪৬. মার্কসীয় বিবেচনার একটু প্রায়োগিক দৃষ্টি ব্যবহারে এখানে তিনটি শ্রেণি বলা হয়েছে। সর্বহারা ও বুর্জোয়ার মধ্যবর্তী অবস্থানে রূপান্তরকামী স্তরকে এখানে একটি শ্রেণি হিসেবে আলোচনার সুবিধার্থে কল্পনা করা হয়েছে।

৪৭. কার্যত এই দ্বিধান্বিত আচরণ-ই গল্পটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে এবং এর নামকরণকে করে তুলেছে সার্থক। কেননা এই দ্বিধার কারণে একটি রূপান্তরকামী মধ্যবিত্ত চরিত্রের অন্তর্গত টানাপড়েন হয়ে উঠেছে স্পষ্ট এবং শেষপর্যন্ত একটি স্তর থেকে অন্য একটি স্তরে পারাপার প্রক্রিয়াটি করে তুলেছে পাঠকের দৃষ্টিগ্রাহ্য।

৪৮. 'পারাপার'; *পারাপার*, শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প, প্রথমপ্রকাশ : পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঢাকা। পৃষ্ঠা : ২৭

৪৯. মার্কসীয় দৃষ্টিতে চরম বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি।

৫০. মার্কসীয় বিবেচনায় ওলির এই আচরণ তাকে অনেকটা সমাজের সেই নিম্নমধ্যবিত্তের মতো, বুর্জোয়া হয়ে ওঠা স্বপ্ন যার কিন্তু টিকতে না পেরে যে ফিরে আসে নিজেরই সীমায়ত পরিসীমার নিম্নবিত্তবৃত্তে। মার্কস-এঙ্গেলসের ভাষায় :

"নিম্ন মধ্যবিত্ত... ঘটনাচক্রে তারা যদি বিপ্লবী হয়, তবে তা হয় কেবল সর্বহারা শ্রেণিতে তাদের রূপান্তরটা আসন্ন হয়ে উঠেছে বলে; এভাবে তারা তাদের বর্তমান স্বার্থ

নয়, বরং রক্ষা করে তাদের ভবিষ্যৎ স্বার্থ, তারা ত্যাগ করে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সর্বহারাশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজের অবস্থান নির্ধারণের জন্যে।"– বুর্জোয়াশ্রেণি ও সর্বহারাশ্রেণি; কমিউনিস্ট পর্টির ইশতেহার/ অনুবাদঃ সেরাজুল আনোয়ার; পৃষ্ঠা : ৬৫। মে ১৯৯৩, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ঢাকা।

৫১. 'পারাপার'; *পারাপার*, শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প, প্রথমপ্রকাশঃ পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঢাকা। পৃষ্ঠা : ৩২

৫২. শব্দটি 'পূর্বসুরি' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যাঁদেরকে প্রবন্ধের শুরুতেই শহীদুল জহিরের অগ্রজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন– সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ কথাসাহিত্যিক।

৫৩. বর্ণনায় চৈতন্যপ্রবাহরীতির সঙ্গে মার্কসবাদী জীবনভাবনার সমন্বয়– ওয়ালীউল্লাহ্-ইলিয়াস ও হাসান আজিজুল হকের রচনাসমূহে মানুষের জীবনের স্বরূপ অঙ্কনের ভাষ্যরূপে প্রায়শই যে সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

৫৪. 'পারাপার', *পারাপার* : শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প, প্রথমপ্রকাশঃ পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঢাকা। পৃষ্ঠা : ২৭

৫৫. শ্রেণিচরিত্রের সঙ্গে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ, আত্ম-অহম রক্ষার চেষ্টাকেই প্রায়শ করণীয় করে তোলে। ওলির এই ভাবনা সেই প্রশিক্ষিত মূল্যবোধজারিত।

৫৬. এ-প্রসঙ্গে ফ্রানজ্ ফানোর 'ব্লাক স্কিন হোয়াইট মাস্ক' গ্রন্থের বক্তব্য-বিশ্লেষণ স্মরণযোগ্য। বর্ণবৈচিত্র্যের স্বাভাবিকতা শ্বেতাঙ্গ শোষকেরা যখন নাশ করে দেয় 'উত্তমর্ণ-অধমর্ণ' বিষয়ক বোধের চর্চার মাধ্যমে এবং দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হবার পরেও যখন আপাত মুক্ত মানুষ সেই বোধ-বিশ্বাসের লালন করে অন্তস্তলে পরাধীন থেকে যায়। গাত্রবর্ণকেন্দ্রিক সেই উত্তর-উপনিবেশী মনের সন্ধান পাওয়া যায় শহীদুল জহিরের 'মাটি ও মানুষের রং' শীর্ষক এই গল্পে।

৫৭. বাক্যটির গঠন দেখেই অনুধাবন করা যায় যে এই বাক্যে বক্তার বিশ্বাস কোন বর্ণান্ধ ঔপনিবেশিকতায় নিবদ্ধ, এবং সৌন্দর্য-সংক্রান্ত ভাবনার প্রকাশে তার শ্রেয়তার পাল্লা কোন রঙের প্রতি অনুগত। এখানে লোকমনে গোরারঙের প্রভুত্ববাদী যে বিশ্বাস রয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

৫৮. লেখকের এই বিশ্লেষণপূর্ণ বর্ণনাংশ অনেকটাই বহুস্তরিক (Polyphonic)। 'ছিনালগো পোলা সুন্দরই অয়'– এই ক্ষুব্ধ উচ্চারণে নিজের শ্রেণি আভিজাত্যের মান রক্ষার পাশাপাশি মনের ভেতর দীর্ঘকাল পুষে রাখা ক্ষোভেরও প্রকাশ দুর্লক্ষ্য নয়। একইসঙ্গে আসিয়া বেগমের মনোলালিত মার্জিত বোধের গহীনে লুক্কায়িত গ্রাম্য ভাষার বুননে অশ্লীল রুচিজ্ঞানেরও প্রকাশক এই ক্ষুব্ধ উচ্চারণ।

৫৯. আম্বিয়ার এই ফেটে পড়া যেন ভিন্নমাত্রিক শোষণের বিপরীতে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ। মার্কসীয় বিবেচনায় সর্বহারার বিপ্লবের অধুনাতর রূপ; উত্তরাধুনিক নারীবাদের মন্ত্রে পূত কোনো নারীসত্তার আত্মম্ভর উচ্চারণ।

৬০. "বহিরাগত জাতির সাম্রাজ্য শেষ হয়ে যাবার পর, স্বাধীন দেশটির এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশটিতে জীবনের সর্বস্তরে যা ঘটে তা-ই উত্তর- ঔপনিবেশিকতা।"– মলয়

রায়চৌধুরী : উত্তর-ঔপনিবেশিকতা/ হাওয়া ৪৯, সম্পাদক: সমীর রায়চৌধুরী, পৃষ্ঠা– ১৭, শারদ ১৯৯৬, কলকাতা

৬১. শ্রেণিগত আভিজাত্যবোধ ও তার মানবর্ধন– এই চিন্তা থেকে এ-দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হলেও শেষপর্যন্ত তা শুধু শ্রেণির মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ থাকেনি, তাত্ত্বিকবিচারে তা উপনীত হয়েছে উত্তর-ঔপনিবেশিক বর্ণবাদী দ্বন্দ্বে।

৬২. এ-দুয়ের সংশ্লেষণেই শহীদুল জহির গল্পটিকে করে তুলেছেন বহুস্তরিক পাঠসম্ভব।

৬৩. 'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে', *পারাপার*, শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প, প্রথমপ্রকাশ : পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঢাকা। পৃষ্ঠা : ৪১

৬৪. প্রান্তিক একটি উন্মূল চরিত্রকে লেখক এই বর্ণনার সাহায্যেই গল্পটির কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত করলেন। উদ্ধৃতাংশের মধ্যে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান যে, লেখক এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটির মাধ্যমে আনন্দ পাল লেনের জনমানুষের মানস চেহারার পরিবর্তন দেখাতে চান। অর্থাৎ সমষ্টির কেন্দ্রে অবস্থান করে সে-ই নিয়ন্ত্রণ করবে পরিপার্শ্বের জনসমষ্টিকে।

৬৫. 'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৪১

৬৬. কৌমজীবনের অভ্যন্তরে মিশে যেতে চাইলে যে কয়েকটি মৌল-যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, অভিন্ন গঠনের ভাষাকাঠামো তন্মধ্যে অন্যতম। কিন্তু যোগাযোগের এই মাধ্যমটিতেই নবাব আর সবার থেকে পৃথক (Alien) হয়ে যায়; নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। আর সেই স্বাতন্ত্র্যই তাকে অপরাপর মহল্লাবাসীর কাছে অপর করে তোলে। ফলত গল্পের দ্বন্দ্ব জমে ওঠে, ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়।

৬৭. সাধারণ সন্দেহ থাকলেও নবাবের পেশা-সম্পর্কিত অজ্ঞতা মহল্লার মানুষকে একটু সংকুচিত রেখেছিল তার সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত মন্তব্য করার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ নিম্নতর হলেও নবারের একটা সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে মৌনবিশ্বাস লালন করে। কিন্তু নবাবের নিম্নতর পেশা সম্পর্কে জানাজানির পর তারা নিশ্চিত হয়ে যায় এবং তাকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলতে দ্বিধাবোধ করে না। অর্থাৎ সন্দেহাতীতভাবে তারা তাদের আচরণের মাধ্যমে নবাবের সামাজিক অবস্থান নির্দেশ করে।

৬৮. 'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে', *পারাপার*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ৪৬। এখানে "নেপাল ঠাকুরের বুকের ওপর ভারি পাথরের মতো চেপে বসে নবাব দিন মাস কাটিয়ে দিতে লাগল। সূর্য অস্ত আর উদয়ের বিন্দুতে চক্কর খেল আনন্দ পাল লেনের রাস্তার উপর একঘেয়ে হলুদ আলো ফেলে ফেলে"– এই বাক্য দুটির গাঠনিক বৈশিষ্ট্যে সুস্পষ্টভাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভঙ্গি লক্ষণীয়; 'রাস্তার উপর একঘেয়ে হলুদ আলো'– এই চিত্রধর্মী বাক্যাংশটুকু সচেতন পাঠকমাত্রকেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'নয়নচারা' গল্পের কোনো চিত্রকে মনে করিয়ে দেয়।

৬৯. 'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে', *পারাপার*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৪৭

৭০. গল্পটিতে শহীদুল জহির অবপ্রাণীপ্রসঙ্গ প্রচুর ব্যবহার করেছেন। অনেকবার বুকে হাঁটা প্রাণীর প্রসঙ্গ এনে মহল্লাবাসী ও নবাবের মনের নীচতা, অবগুণ্ঠনপ্রবণতা ও বিরুদ্ধবাস্তবতার অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন অবপ্রাণীর সহযোগে। যেমন: "ফজলুর

মাথার মধ্যে দিয়ে একটা পোকা হেঁটে যায়"/ "নবাবকে নিয়ে সকলের অস্বস্তি ভেতরে পিঁপড়ের মতো সুড়সুড় করে হাঁটে"/ "লোকে অবশ্য তাকে নির্বোধ ভাবতে রাজি না। ভাবে, শালা ঘুঘু।" ইত্যাদি। 'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে', *পারাপার*, পূর্বোক্ত।

৭১. 'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে', *পারাপার*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৫৪

৭২. পূর্বোক্ত

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ৪৮। প্রাসঙ্গিকভাবে মন্তব্য করা যেতে পারে যে, পিতার অসম্মানিত সামাজিক অবস্থান-সম্পর্কিত নবাবের সচেতনতা ও প্রবল লজ্জাবোধ তাকে ব্যক্তিত্বকামী সত্তায় উন্নীত করে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ববোধজাগর ছিল বলেই হয়তো নবাব পরবর্তীকালে 'লেঙ্গুর' বাপের ল্যাঙবোট পুত্র হতে পারেনি। এটি নিঃসন্দেহে তার চরিত্রের অন্তর্নির্দেশী।

৭৪. একজন বন্ধনবিরোধী স্বাধীনতাকামী চরিত্রের পক্ষে যে কোনো দায়িত্বে জড়িয়ে পড়াটাই স্বভাববিরুদ্ধ; সেক্ষেত্রে একজন শীলিত বাংলাভাষী হিসেবে নবাবের সুইপারের চাকরি করাটা নিঃসন্দেহে স্বভাববিরুদ্ধ।

৭৫. ভবিতব্যের বিস্তীর্ণ পথের পথিক হবার স্বপ্ন যেন চরম বিপদেও নষ্ট হতে দিতে চায় না নবাব। জরিনা যে দায়িত্ব দিয়ে গেছে তাকে, তা বাস্তবায়নের স্বপ্নকে অপূর্ণ রাখবে না সে – এমন আশাবাদিতায় বিভোর এক চরিত্র হিসেবেই নবাবকে উত্তীর্ণ করতে চেয়েছেন শহীদুল জহির। তাই তার সুখসময়ের সুন্দর কল্পনা সুললিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন তিনি, তাতে বর্ণনার ভাষা হয়ে উঠেছে কাব্যিক। ছোট ছোট বাক্যে ধরতে চেয়েছেন জীবনের বহমান গতিকে।

৭৬. শহীদুল জহিরের সমগ্রকথাসাহিত্যে বিস্তৃত স্থানাভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় তার সিংহভাগ দখল করে আছে পুরান ঢাকার বিভিন্ন মহল্লা, গলি, বাজার ইত্যাদি। সে বিচারে প্রথম গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প 'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে'-তে পুরান ঢাকার একটি মহল্লার জীবনের রংবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলে তিনি যেন ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছেন।

গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি

ওবায়েদ আকাশ, সম্পা. (২০০৮), *শালুক*, ঢাকা

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (২০০৪), *সংস্কৃতি-কথা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, সম্পা. (২০১০), *শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

শহীদুল জহির (২০০৬), *শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প*, পাঠকসমাবেশ, ঢাকা

সমীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত (১৯৯৬), *হাওয়া ৪৯*, কলকাতা

সেরাজুল আনোয়ার অনূদিত (১৯৯৩) *কমিউনিস্ট পার্টিরইশতেহার*, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ঢাকা

Frantz Fanon (2008), *Black Skin White Masks,* Pluto Press, London